নবপর্যায় : ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২০

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

ট্রাস্টি আলী যাকের-এর প্রয়াণে
যুক্ত রয়েছে বিশেষ ক্রোড়পত্র

অন্ধকারের উৎস হতে

প্রমিলা বিশ্বাস

১লা ডিসেম্বর ২০২০,মঙ্গলবার,বিকেল ৪টা। বিজয়ের মাসের প্রথম দিন। বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় সংগীতের বিশেষ প্রস্তুতিমূলক অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ আট মাস পর শুরু হল বধ্যভূমির সন্তানদলের গানের অনুশীলন। সেই কবে মার্চ মাসে ওদের অনুশীলন হয়েছিল। তখন স্বাধীনতা উৎসবের প্রস্তুতি প্রায় শেষ। ঠিক সেই মূহুর্তে করোনা ভাইরাস সব এলোমেলো করে দিল। জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ প্রাঙ্গণে আয়োজন করা সম্ভব হল না ২৪-২৬ মার্চ ৩ দিনব্যাপী স্বাধীনতা উৎসব, ২১ জুন জল্লাদখানার ত্রয়োদশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী,এমনকি এবারের ১৪-১৬ ডিসেম্বর বিজয় উৎসবের। তবু থেমে নেই বধ্যভূমির সন্তানদল। নতুন উদ্যমে আবার শুরু হয়েছে অনুশীলন। বর্তমানে সপ্তাহে দুই দিন বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বিকেল চারটায় শারিরীক দুরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে ওদের গানের অনুশীলন চলছে। জল্লাদখানার পাশে একটি ভাড়া নেয়া ঘরে ওদের অনুশীলন করানো হয়। কিন্তু ঐ ছোট্ট ঘরে তো আর করোনাকালীন সময়ে গানের অনুশীলন করা সম্ভব নয়। সাথে অভিভাবকদেরও অনাগ্রহ। তাই বাধ্য হয়েই করোনাকালীন নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় বন্ধই থাকে গানের অনুশীলন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক জল্লাদখানা পরিদর্শনে এসে বধ্যভূমির সন্তানদলের অনলাইনে গানের অনুশীলন পুনরায় শুরু করতে বলেন। কিন্তু অনলাইনে নির্দেশনা থাকলেও শিক্ষার্থীদের অনিচ্ছায় সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তারা সশরীরে উপস্থিত থেকে অনুশীলনে আগ্রহ প্রকাশ করে। এমতাবস্থায় জল্লাদখানার প্রাঙ্গণে সবুজ ঘাসে আবৃত লনের ওপর অনুশীলন করানোর পরিকল্পনা করি। বিষয়টি ট্রাস্টিবৃন্দকে অবগত করলে তাঁরা সম্মতি প্রদান করেন। তারপর থেকে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণে চলছে গানের অনুশীলন। ওরা গাইছে দেশমাতৃকার গান, মানবতার গান,নিপীড়িত মানুষের গান, শিকল ভাঙ্গার গান, ভাটিয়ালী,পল্লীগীতি প্রভৃতি ধারার গান। যে গান শুনিয়ে তারা উজ্জীবিত করে জনমানুষকে। স্বাধীনতা উৎসবে, মুক্তির উৎসবে,প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বিজয় উৎসবে। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী,রাজাকার ও

তাদের দোসরদের সহযোগিতায় মিরপুর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে মুক্তিকামী নিরীহ বাঙালীদের ধরে এনে নির্মমভাবে হত্যা করা হত এই জল্লাদখানায়। ৪০ ফিট গভীরতার পাম্পহাউজটি তখন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল লাশে। ১৯৯৯ সালের ১৫ নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৪৬ পদাতিক ব্রিগেড-এর সহযোগিতায় খনন কাজ চালানো হয়। সন্ধান পাওয়া যায় বেশ কিছু শহীদ পরিবারেরও। সেই শহীদ পরিবারের তৃতীয় প্রজন্ম এই বধ্যভূমির সন্তানদলের শিক্ষার্থীরা। এদের মধ্যে কারো নানা,কারো দাদা কারো বা মামাকে ধরে এনে হত্যা করা হয়েছে এই জল্লাদখানায়। ২০০৮ সালে গঠিত হয় বধ্যভূমির সন্তানদল নামের সংস্কৃতিচর্চার এই দলটি। যার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন প্রয়াত জিয়াউদ্দিন তারিক আলী সহ অন্যান্য ট্রাস্টিবৃন্দ। যাঁরা সকলের কানে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন 'মুক্তির গান'।

২৭ নভেম্বর ২০২০ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি, ৭১-এর শব্দসৈনিক, বরেণ্য অভিনেতা-নাট্যপরিচালক ও সংস্কৃতিজন আলী যাকের প্রয়াত হন। তার স্মরণে বিশেষ ক্রোড়পত্র দেখুন

অনলাইন ভিত্তিক নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনী

রঞ্জন কুমার সিংহ

করোনা মহামারীর বিরূপ পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দরজা বন্ধ থাকলেও মনের জানলা দিয়ে নিরন্তর আপনাদের কাছে পৌঁছানোর কাজ আমরা নানাভাবে করে যাচ্ছি। তারই প্রতিফলন হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর 'জুম'-এর মাধ্যমে অনলাইনে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ এবং ঢাকা বিভাগের তিন জেলা গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলার নেটওয়ার্ক শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত শিক্ষক সম্মিলনীতে আপনাদের অংশ গ্রহণ আমাদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে।

১৪ নভেম্বর ঢাকা মহানগর উত্তরের ৩২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৪৪ জন এবং ২১ নভেম্বর ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ৩৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠনের ৪৭ জন নেটওয়ার্ক শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান প্রধান ৩৫ ও ৩৬তম অনলাইন ভিত্তিক শিক্ষক সম্মিলনীতে অংশ গ্রহণ করে। সম্মেলন শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর। সম্মেলনে ঢাকা মহানগরীর আউটরিচ কর্মসূচির নানা কর্মকান্ডের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন রনিকা ইসলাম। আউটরিচ কর্মসূচির সারসংক্ষেপ উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের উজ্জিবিত করে মুক্তির উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন ঢাকা মহানগর উত্তরের নিয়াজ ফাতেমা সিদ্দিকা- প্রধান শিক্ষক ইউসেপ ইসমাইল স্কুল, সফিউল গণি-প্রধান শিক্ষক, আব্দুল্লাহ মেমোরিয়াল হাইস্কুল, এম এ হামিদ-প্রধান শিক্ষক, হযরত শাহ আলী মডেল উচ্চ বিদ্যালয় এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ব্রাইট স্কুল এন্ড কলেজের উপাধক্ষ্য হারুণ অর রশিদ, বংশাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সেতারা বেগম ও ইউসেপ আর কে চৌধূরী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শিরিন পারভিন। অভিজ্ঞতা বর্ণনা শেষে ট্রাস্টি মফিদুল হক নতুন বাস্তবতায় জাদুঘরের কার্যক্রম ও শিক্ষক সম্পৃক্তি (অনলাইন প্রদর্শনী, বুলেটিন, ফেসবুক ও প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য ইত্যাদি) বিষয় নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেন।

নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের তিনটি আলোচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরুর পূর্বে ষষ্ঠ শ্রেণির শওকত ওসমানের তোলপাড় গল্প অবলম্বনে নির্মিত তথ্যচিত্র প্রদর্শন

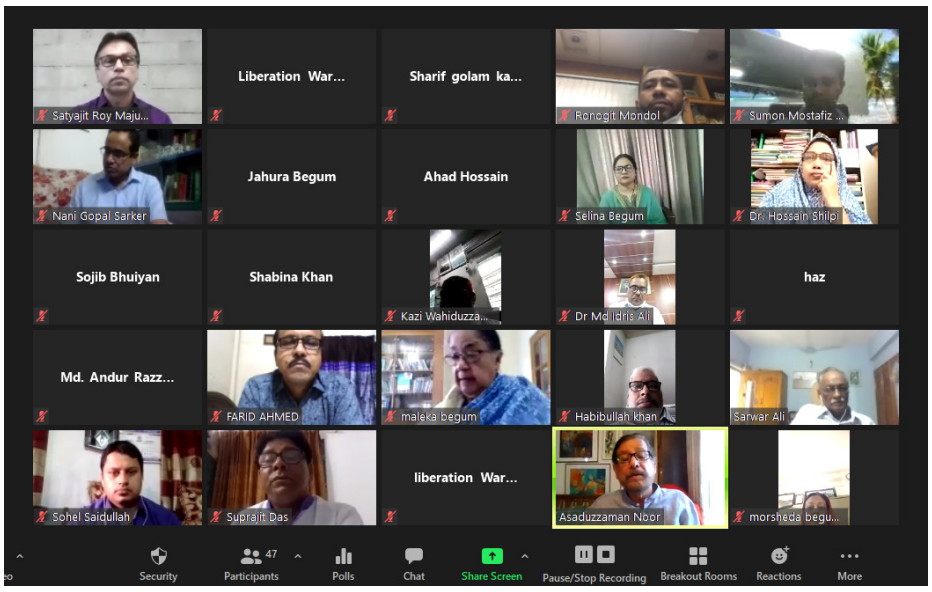

করা হয়। তথ্যচিত্র প্রদর্শন শেষে তিনটি আলোচ্য বিষয় : ক. আউটরিচ কর্মসূচি বাস্তবায়নে শিক্ষকদের সম্পৃক্ততা এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া যায়, খ. মুক্তির উৎসব ২০২১ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহনে নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের করণীয় এবং গ. ফেসবুক, অনলাইন সেমিনার, অনলাইন প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠানে নেটওয়ার্ক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা উপায় বিষয়ের উপর নেটওয়ার্ক শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান প্রধানেরা আলোকপাত করেন। আলোচনায় অনেকে সুপারিশ করেন পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের ঘটনা বয়স ভিত্তিক সংযুক্ত করা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তথ্যচিত্র বিদ্যালয়ে প্রদান করা, প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাথে আলোচনা করে অনলাইনে ক্লাসে মুক্তিযুদ্ধের তথ্যচিত্র দেখানোর ব্যবস্থা করা। এছাড়া ওয়েব সাইটে মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য চিত্র ও চিত্র প্রদর্শনী সংযুক্ত এবং ফ্রি ব্রাউজিং ব্যবস্থা করা। মুক্তির উৎসব অনুষ্ঠান কোভিড ১৯ মহামারী অনুকূল পরিস্থিতি না হলে অনুষ্ঠান ধারণ করে অনলাইনের মাধ্যমে আয়োজন করার মত প্রকাশ করেন। আলোচ্য বিষয় নিয়ে শিক্ষকদের আলোচনা শেষে সারসংক্ষেপ বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণের মানিক নগর মডেল হাইস্কুলের সিনিয়র শিক্ষক সুপ্রজিৎ দাস এবং ঢাকা মহানগর উত্তরের মোহাম্মদপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মো. মাসুদ আহমেদ।

২৭ নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি বীর মুক্তিযোদ্ধা শব্দ সৈনিক আলী যাকেরের প্রয়াণে ২৮ নভেম্বর ২০২০ এর পরিবর্তে ৫ ডিসেম্বর ঢাকা বিভাগের তিন জেলা গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলার ৪৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪৪জন

এরপর ৫-এর পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী বিক্রম কুমার দোরাইস্বামীর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

আমেনা খাতুন, *কনজারভেটর এন্ড আর্কিভিস্ট*

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলীর তত্ত্বাবধানে গত দুই সপ্তাহ ধরে বিজয় দিবস অনুষ্ঠানের পরিকল্পনার পাশাপাশি বাংলাদেশে ভারতের নব নিযুক্ত হাই কমিশনার-এর জাদুঘর পরিদর্শনের পরিকল্পনা চলছিলো। অন্যান্য বারের থেকে এবারের হাইকমিশনার-এর পরিদর্শন প্রস্তুতিটি ছিলো ভিন্ন ধরনের। সারওয়ার আলী আগেই তাঁদের চাহিদা মোতাবেক পরিদর্শনের প্রস্তুতি প্রদানের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সে অনুযায়ী বাংলাদেশস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার মাননীয় শ্রী বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা সকাল দশটায় জাদুঘরে প্রবেশ করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক চন্দ্রজিৎ সিংহ, কনজারভেটর এন্ড আর্কিভিস্ট আমেনা খাতুন এবং আউটরিচ কর্মকর্তা রঞ্জন কুমার সিংহ তাঁদের স্বাগত জানান।

মাননীয় হাই কমিশনার শুরুতেই 'শিখা চির অম্লান' এর সামনে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহীদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গ্যালারি পরিদর্শন করেন। আমেনা খাতুন এবং আর্কাইভ ও ডিসপ্লে টিমের সদস্যরা তাঁদের গ্যালারি পরিদর্শনে সার্বক্ষণিক গাইড করেন। তিনি নিজে ইতিহাসের ছাত্র বলে গ্যালারি পরিদর্শনকালে প্রদর্শনীর মান ও কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি আরও অবগত করেন তাঁর বাবা এয়ারফোর্সে ছিলেন এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে এলাইড ফোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বিস্তারিত ধারণা রয়েছে। বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনীর কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এই প্রদর্শনীতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা প্রতিরোধে মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালী লংমার্চ ও বঙ্গবন্ধুর সাথে যেসকল কাজে সাদৃশ্য রয়েছে সেসকল বিষয়ে উভয়ের কর্মকাণ্ডের নানান তথ্য-উপাত্ত প্রদানে জাদুঘরের সহযোগিতার প্রশংসা করেন। গ্যালারি প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হয়ে নির্ধারিত সময়ের অধিক সময় ধরে তিনি গ্যালারি পরিদর্শন করেন। একাধিকবার বলেন, 'I must say that the curation is greatly done'. গ্যালারি পরিদর্শন শেষে ক্যাফেটেরিয়ার খোলা চত্বরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক আমন্ত্রিত 'তরুণ ডেলিগেশন ২০১৯'-এর ২০জন বাংলাদেশী তরুণের সাথে মাননীয় হাই কমিশনারের একটি অনানুষ্ঠানিক প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী এবং মাননীয় হাই কমিশনার সকলের উদ্দেশে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় ভুটান এবং পরে ৬ ডিসেম্বর ভারত। ঠিক এই দিনেই বিশেষ আয়োজনের মাধ্যমে তাঁর জাদুঘর পরিদর্শন বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। অত্যন্ত প্রীতিময় পরিবেশে তিনি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের সাথে যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা আরও সুদৃঢ় হওয়ার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

প্রশ্নোত্তোর পর্বে ৪জন তরুণ কথা বলেন। হাই কমিশনার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

ভারতীয় হাই কমিশনার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে স্মারক উপহার হিসেবে ১৯৭১ সালে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডার জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের আলোকচিত্র ও দলিল ফ্রেম বন্দি করে ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলীর হাতে তুলে দেন। এবং মুক্তিযুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আলোকচিত্র, দলিল, সংবাদপত্র, আলোকচিত্রী রঘু রাইসহ বিশিষ্টজনের সাক্ষাৎকার, অন্যান্য স্মারকের স্ক্যান কপি (পেন ড্রাইভে) প্রদান করেন। তিনি জাদুঘরের বিশেষ অতিথি বইয়ে মন্তব্য লিখেছেন-

This beautiful museum is simultaneously a labour of love and a heartfelt homage to the nation of Bangladesh. It resonates, 49 years later, the pain, suffering and grief of the millions of lives lost, as well as the triumphs of human values that underpinned the philosophy and ideology of Bangabandu's leadership. Curated with dedication, skill and deep emotion, this museum is a superb tribute to the vision of a secular, democratic and harmonious Bangladesh.

I also gratefully acknowledge the generosity of the museum in recognizing the supportive role of Indian in assisting the Great people's war of the Bangladeshi people.

Vikram Doraiswami
6 December 2020

স্মৃতির পথে হাঁটা

নাওয়াকি উসুই বাংলাদেশে এসেছিলেন ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে, মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মাসে। উনিশ শ' একাত্তরের এই ডিসেম্বরের দিনগুলোতেই তিনি পশ্চিম সীমান্তে যশোর-খুলনা অঞ্চলে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর অগ্রাভিযানের সাথী হয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের বিজয়। তরুণ সাংবাদিক হিসেবে তাঁর ক্যামেরায় বন্দি করেছিলেন সেই অনুপম সময়ের অনেক আলোকচিত্র। তিনি সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন একাত্তরের বেশ কিছু আলোকচিত্র যা তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রদান করেন।

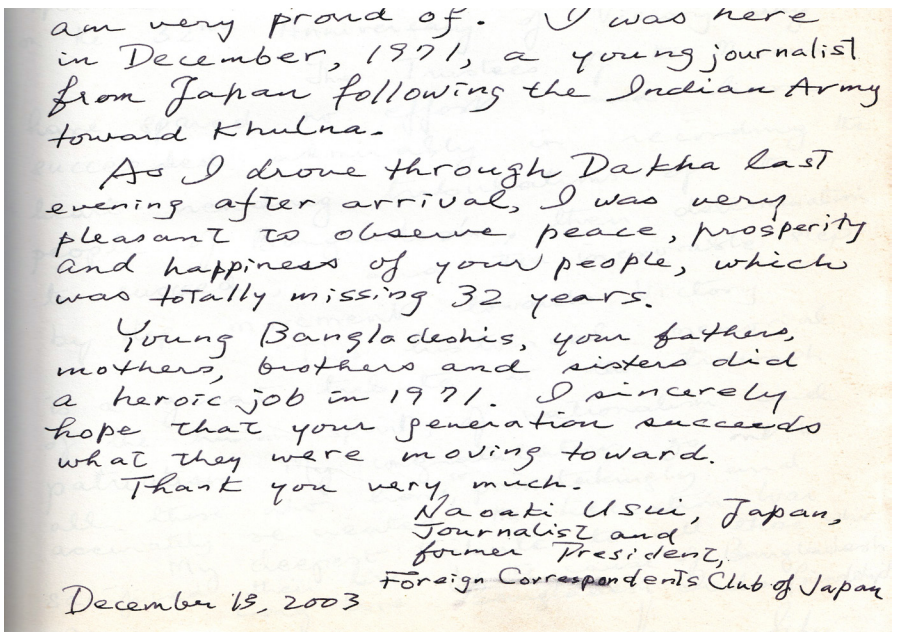

am very proud of. I was here in December, 1971, a young journalist from Japan following the Indian Army toward Khulna.

As I drove through Dakha last evening after arrival, I was very pleasant to observe peace, prosperity and happiness of your people, which was totally missing 32 years.

Young Bangladeshis, your fathers, mothers, brothers and sisters did a heroic job in 1971. I sincerely hope that your generation succeeds what they were moving toward.

Thank you very much.

Naoaki Usui, Japan,
Journalist and
former President,
Foreign Correspondents Club of Japan

December 13, 2003

পালিত হলো বিশ্ব গণহত্যা স্মরণ দিবস

৯ ডিসেম্বর ২০২০

নওরিন রহিম

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড এ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) গত ৯-১০ ডিসেম্বর ২০২০ দুটি পৃথক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে প্রতি বছর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সপ্তাহব্যাপি বিজয়ের উৎসব আয়োজন করে আসছে, তার অংশ হিসেবেই এই দুটি দিবসে অনলাইন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব গণহত্যা স্মরণ দিবসে সূচনা বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সিএসজিজের পরিচালক মফিদুল হক। জাতিসংঘের মহাসচিবের বক্তব্য পড়ে শোনান সিএসজিজের হাসান মাহমুদ। জাতিসংঘের দ্বারা নির্মিত একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শিত হয়। এরপর গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান GMMAAC (গামাক)-এর পরিচালক সিলভিয়া ফার্নান্দেজের বক্তব্য প্রদর্শিত হয়। এরপর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য বক্তব্য প্রদান করেন মিস ওফেলিয়া লিয়ন (প্রেসিডেন্ট, আইসিমেমো)।

বিশ্বে যেসব রাষ্ট্র পূর্বে গণহত্যার শিকার হয়েছে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী একদল তরুণ তাদের নিজ নিজ দেশের অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন। বাংলাদেশ, নেপাল, ক্যাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পূর্ব -তিমুর শ্রীলংকা ও পোল্যান্ড এ পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

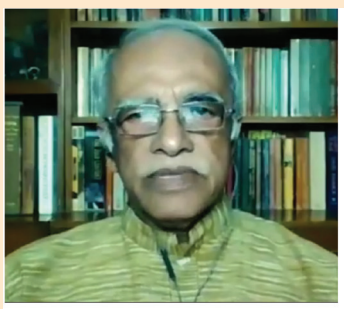

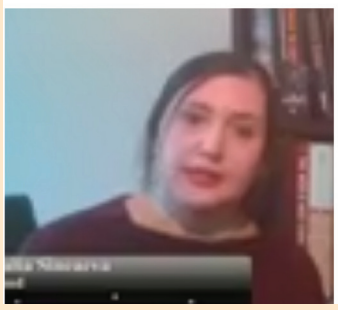

মুজিব শতবর্ষে বিজয় উদযাপন

মানবাধিকার দিবস থেকে বিজয় দিবস

১০-১৬ ডিসেম্বর ২০২০

১০ ডিসেম্বর ২০২০ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ড. সারোয়ার আলী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নাসিমা বেগম (এনডিসি), চেয়ারপার্সন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এরপর বার্ষিক স্মারক বক্তৃতা পর্বে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসাইন। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর মানবাধিকার দর্শন বিষয়ে বক্তা আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গান পরিবেশন করেন বাউল শাহাবউদ্দিন, সভ্যতার মাকসুদ ও ঢাকা এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীর পরিবেশনাও দেখানো হয়। অনলাইনে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনের উপস্থাপনা করেন সিএসজিজের সমন্বয়কারী নওরিন রহিম।

অষ্টম অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স

(৫-২৮ নভেম্বর, ২০২০)

টানা অষ্টমবারের মতো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) মাসব্যাপী জেনোসাইড ও ন্যায়বিচার বিষয়ক কোর্স সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছে। গত ০৫ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া কোর্সটি দ্বিতীয়বারের মতো অনলাইনে পরিচালনা করা হয়। কোর্সটিতে দেশের ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের স্ব স্ব শিক্ষাপ্রিষ্ঠানকে প্রতিনিধিত্ব করেন। তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য।

কোর্সে প্রথমবারের মতো বিজিসি ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছেন। অন্যান্যদের মাঝে ছিলেন আইনজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, গণমাধ্যম কর্মী এবং সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা। আইন বিভাগের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, ইংরেজি সাহিত্য, সাংবাদিকতা, বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ অধ্যায়ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে কোর্সটি পরিচালনা করা হয়।

নভেম্বর মাসের প্রতি বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনিবার সন্ধ্যায় জেনোসাইড এবং যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে দেশ বিদেশের অভিজ্ঞ বক্তারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে কোর্সটি পরিচালনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ড থেরেসা দ লাঙি (জেনোসাইড স্কলার আমেরিকা), প্যাট্রিক বার্জেস (অস্ট্রেলিয় আইনজীবী ও প্রেসিডেন্ট, এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস), ইরেনে ভিক্টোরিয়া ম্যাসিমিনো (আর্জেন্টাইন আইনজীবী), ডএমএ হাসান (বিজ্ঞানী ও আহবায়ক, ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংস কমিটি), শাহরিয়ার কবির (প্রেসিডেন্ট, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি) জুলিয়ান ফ্রান্সিস (মানবাধিকার কর্মী), তাপস কুমার দাস (সহযোগি অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ইমরান আজাদ (প্রভাষক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস) প্রমুখ।

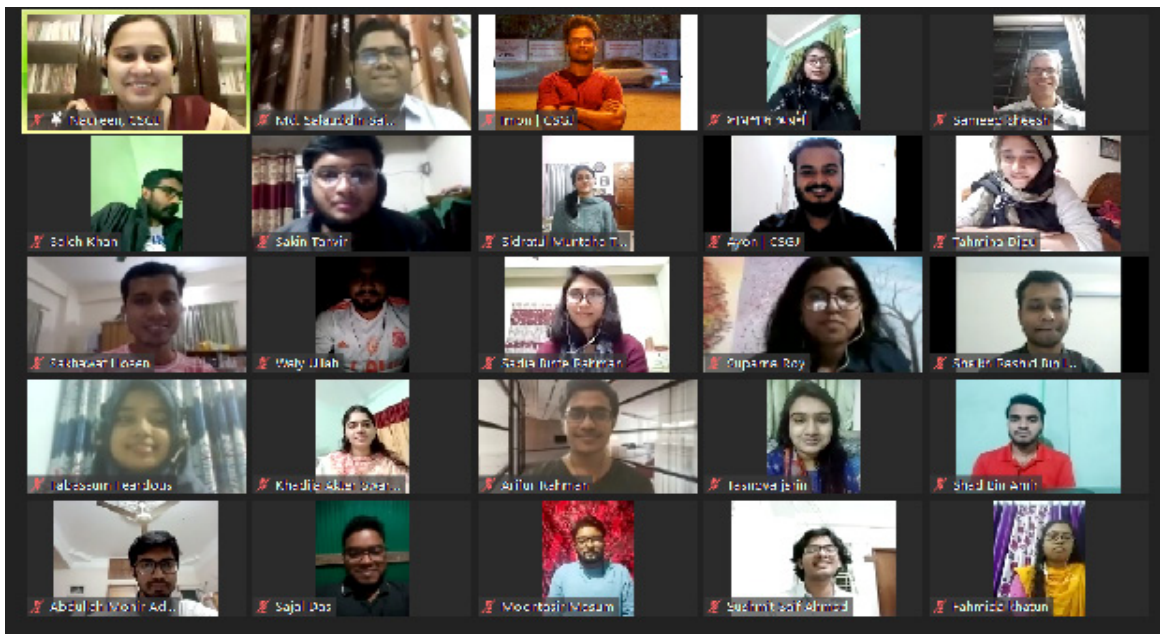

১৯৪৭ সালের দেশভাগ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঘটে যাওয়া গনহত্যা, ক্যাম্বোডিয়া এবং রোহিঙ্গা গনহত্যাসহ নানা ধরনের আন্তর্জাতিক অপরাধ ও তাদের বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য ভাবে স্থানপায় এই কোর্সটিতে। কোর্সটি তে এসব আন্তর্জাতিক অপরাধের থেকে উত্তরণের কৌশল, আন্তর্জাতিক আদালত ও বিচার ব্যাবস্থা নিয়েও আলোকপাত করা হয়। কোর্সটিতে প্রতিটি ক্লাসের শেষে ছিলো একটি করে প্রশ্নোত্তর পর্ব। যেখানে অংশগ্রহণকারীরা বক্তাদের সাথে সরাসরি অভিমত প্রকাশের সুযোগ পান। মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত এই সার্টিফিকেট কোর্সটির সমাপ্তি ঘটে একটি মৌখিক মূল্যায়নের মাধ্যমে। পুরো কোর্সটিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা হয়।

টিজেএএন - সিএসজিজের ওয়েবিনার সিরিজের তৃতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত

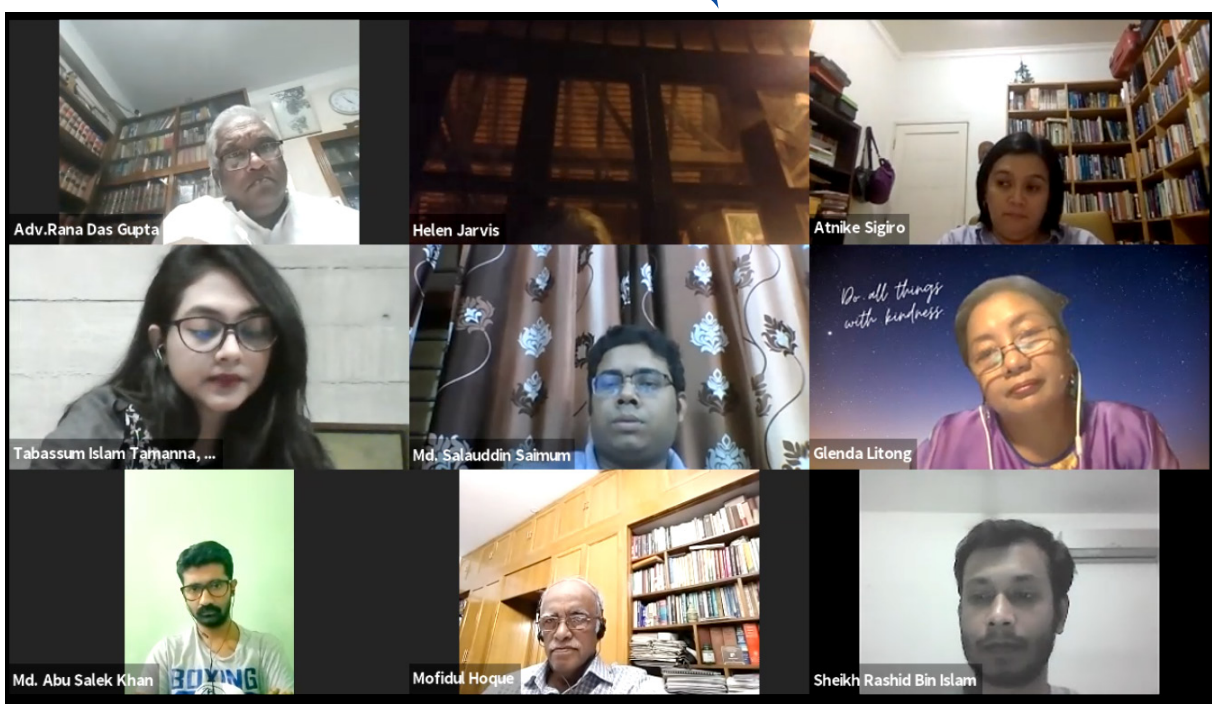

১৯ নভেম্বর, বিকেল পাঁচটায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) এবং ট্রানজিশনাল জাস্টিস এশিয়া নেটওয়ার্ক (টিজেএএন)- এর যৌথ উদ্যোগে ওয়েবিনার সিরিজের তৃতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এশীয় অঞ্চল জুড়ে ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতা প্রসারের লক্ষ্যে টিজেএএন এবং সিএসজিজে এক সাথে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায় পরিবর্তনীয় বিচার ব্যবস্থা কিংবা ট্রানজিশনাল জাস্টিস মেকানিজমের সাথে এশীয় অঞ্চলের জনসাধারণের পরিচয় সাধনই এই ওয়েবিনার সিরিজের মূল লক্ষ্য। যার ফলশ্রুতিতে, ট্রানজিশনাল জাস্টিসের মূল স্তম্ভগুলোকে কেন্দ্র করে ওয়েবিনার পরিচালিত হচ্ছে।

এবারের ওয়েবিনারের শিরোনাম ছিল, আন্তর্জাতিক অপরাধের ক্ষতিপূরণ। ওয়েবিনারে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং বাংলাদেশের তিনজন বক্তা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক আদালত ব্যাবস্থায় ক্ষতিপূরণ ব্যাবস্থার বর্ণনা তুলে ধরেন। ওয়েবিনার সঞ্চালন করেন সিএসজিজের স্বেচ্ছাসেবী গবেষক তাবাসসুম ইসলাম তামান্না । ওয়েবিনারে ইন্দোনেশিয়া থেকে ডা. আটকিন নোভা শিগিরো, ফিলিপাইন থেকে মিস গ্লেন্ডা লিটং এবং বাংলাদেশ থেকে অ্যাডভোকেট রানা দাসগুপ্ত তাদের স্ব-স্ব দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে উক্ত প্রেক্ষাপটে বক্তব্য রাখেন।

ওয়েবিনার শুরু হয় ডা. আটকিনের ইন্দোনেশিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনার মধ্য দিয়ে। সেখানে তিনি ইন্দোনেশিয়ার অতীতের গুরুতর এবং জঘন্যতম মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র তার গবেষণা প্রবন্ধের আলোকে তুলে ধরেন। বিশেষ করে জেনারেল সোহার্থোর সুদীর্ঘ সামরিক শাসনামলে তিমুর লেসতের উপর করা পাশবিক নির্যাতনের উপর আলোকপাত করেন। অতঃপর উক্ত পাশবিক নির্যাতনের অনুসন্ধানের দায়িত্ব ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। উক্ত কমিশনটি কোমনাসাম নামেও পরিচিত ছিলো। তিনি সামরিক শাসনামলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভুক্তভোগীদের কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি তিমুর লেসতের প্রতি সুবিচার না আসায় মানবাধিকার আদালতের ব্যর্থতার কথাও তুলে ধরেন। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালের রাজনৈতিক পালাবদলের পর তৈরি হওয়া মানবাধিকার আদালত আইন কিছুটা আলোর পথ দেখালেও তা আসলে নন-রেট্রোস্পেকটিভ নীতির কাছে হার মানে।

সবশেষে, আটকিন একটিমাত্র জাতীয় ক্ষতিপূরণের কথা উল্লেখ করেন। যা পরবর্তীতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভুক্তভোগীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সেবা খাতে ব্যয়ের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

মিস গ্লেন্ডা লিটং, ফিলিপাইনের আধা বিচারিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বর্ণনার মাধ্যমে আর্থসামাজিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের কথা উল্লেখ করে তার বক্তব্যের সূচনা করেন। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি তার দেশের দীর্ঘ ১৪ বছরের সামরিক শাসনের কথা উল্লেখ করেন। ততকালীন রাষ্ট্রপতি মার্কোসের বিরুদ্ধে সেসময় কোনো জনসাধারণ কখনো আওয়াজ তুলতে পারেনি। যার বড় কারণ ছিল বিভিন্ন প্রশাসনিক ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে মার্কোসের সতীর্থদের অবস্থান। জনগণের কাছে ক্ষমতায় আসার প্রায় ২৭ বছর পরে এইচআর ক্লেইমস বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বোর্ড সামরিক শাসনামলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে। ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় জেনারেল মার্কোসের বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি থেকে। তিনি আরো বলেন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার করা রাষ্ট্রের নৈতিক ও আইনগত দায়িত্বগুলোর মধ্যে একটি। আর্থিক এবং অনার্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য ফিলিপাইন সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপের মধ্যে একটি হচ্ছে এনজিওভিত্তিক ক্ষতিপূরণ। সবশেষে, লিটং ফিলিপাইনে ট্রানজিশনাল জাস্টিস-এর যাত্রা সূচনা এবং নানা স্তর নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে বক্তব্য শেষ করেন।

এক ঘণ্টাব্যাপী এ ওয়েবিনার শেষ হয় অ্যাডভোকেট রানা দাসগুপ্তের বক্তব্যের মাধ্যমে। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তিনি শাসক ও শোষক হিসেবে পাক হানাদার বাহিনীর নানাবিধ অপরাধের কথা আলোচনা করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন তৎকালীন বাংলাদেশের স্থানীয় রাজাকারদের কথা, যারা ছিল পাক হানাদার বাহিনীর সহায়তাকারী। যাদের বিচার বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল স্থাপনের মাধ্যমে শুরু করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ট্রাইব্যুনালটি যুদ্ধকালীন সময়ে নারী-শিশু হত্যা ও নির্যাতন বিষয়ক অপরাধের বিচারকার্য পরিচালনার মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। অ্যাডভোকেট রানা দাসগুপ্ত পরবর্তীতে সৈয়দ মোহাম্মদ কায়সারের মামলার কথা উল্লেখ করেন। যেখানে ধর্ষণের শিকার ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছিল। উক্ত ওয়েবিনার শেষে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিলো। অংশগ্রহণকারীরা এসময় সরাসরি বক্তাদের সাথে আলাপচারিতার সুযোগ পান।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

THE WORLD

INDIAN TROOPS ADVANCE TOWARD PAKISTAN FROM RAJASTHAN

Bangladesh: Out of War, a Nation Is Born

JAI Bangla! Jai Bangla!" From the banks of the great Ganges and the broad Brahmaputra, from the emerald rice fields and mustard-colored hills of the countryside, from the countless squares of countless villages came the cry. "Victory to Bengal! Victory to Bengal!" They danced on the roofs of buses and marched down city streets singing their anthem *Golden Bengal*. They brought the green, red and gold banner of Bengal out of secret hiding places to flutter freely from buildings, while huge pictures of their imprisoned leader, Sheik Mujibur Rahman, sprang up overnight on trucks, houses and signposts. As Indian troops advanced first to Jessore, then to Comilla, then to the outskirts of the capital of Dacca, small children clambered over their trucks and Bengalis everywhere cheered and greeted the soldiers as liberators.

Thus last week, amid a war that still raged on, the new nation of Bangladesh was born. So far only India and Bhutan have formally recognized it, but it ranks eighth among the world's 148 nations in terms of population (78 million), behind China, India, the Soviet Union, the U.S., Indonesia, Japan and Brazil. Its birth, moreover, may be followed by grave complications. In West Pakistan, a political upheaval is a foregone conclusion in the wake of defeat and dismemberment. In India, the creation of a Bengali state next door to its own impoverished West Bengal state could very well strengthen the centrifugal forces that have tugged at the country since independence in 1947.

BENGALIS IN JESSORE CHEER INDIAN ARMY'S ARRIVAL

The breakaway of Pakistan's eastern wing became a virtual certainty when the Islamabad government launched air strikes against at least eight Indian airfields two weeks ago. Responding in force, the Indian air force managed to wipe out the Pakistani air force in the East within two days, giving India control of the skies. In the Bay of Bengal and the Ganges delta region as well, the Indian navy was in unchallenged command. Its blockade of Chittagong and Chalna harbors cut off all reinforcements, supplies and chances of evacuation for the Pakistani forces, who found themselves far outnumbered (80,000 *v.* India's 200,000) and trapped in an enclave more than 1,000 miles from their home bases in the West.

There were even heavier and bloodier battles, including tank clashes on the Punjabi plain and in the deserts to the south, along the 1,400-mile border between India and the western wing of Pakistan, where the two armies have deployed about 250,000 men. Civilians were fleeing from the border areas, and residents of Karachi, Rawalpindi and Islamabad were in a virtual state of siege and panic over day and night harass-

6

TIME, DECEMBER 20, 1971

NOW I RECOGNISE BANGLA DESH — Mrs. Gandhi

Standard Foreign News Desk

INDIA today recognised Bangla Desh as an independent nation as her tanks and infantry smashed their way deeper into East Pakistan.

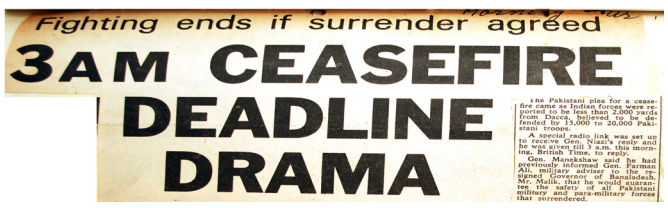
Fighting ends if surrender agreed

3AM CEASEFIRE DEADLINE DRAMA

Expressmen on the spot report

IN THE EAST Indians take fortress, warn ...

IN THE WEST Tanks battle by moonlight

SURRENDER OR DIE!

YAHYA GOES FOR LIFE LINE

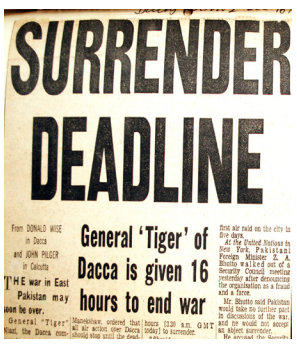
SURRENDER DEADLINE

From DONALD WISE in Dacca and JOHN PILGER in Calcutta

THE war in East Pakistan may soon be over.

General 'Tiger' of Dacca is given 16 hours to end war

The birth of a nation

Daily Express Dec. 17, 1971

Yahya faces chop

foreign currency with

DISMA

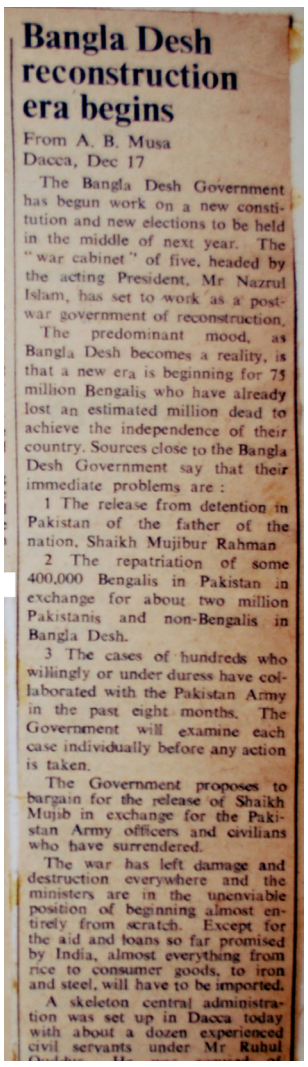
Bangla Desh reconstruction era begins

From A. B. Musa

Dacca, Dec 17

The Bangla Desh Government has begun work on a new constitution and new elections to be held in the middle of next year. The "war cabinet" of five, headed by the acting President, Mr Nazrul Islam, has set to work as a post-war government of reconstruction.

The predominant mood, as Bangla Desh becomes a reality, is that a new era is beginning for 75 million Bengalis who have already lost an estimated million dead to achieve the independence of their country. Sources close to the Bangla Desh Government say that their immediate problems are :

1 The release from detention in Pakistan of the father of the nation, Shaikh Mujibur Rahman

2 The repatriation of some 400,000 Bengalis in Pakistan in exchange for about two million Pakistanis and non-Bengalis in Bangla Desh.

3 The cases of hundreds who willingly or under duress have collaborated with the Pakistan Army in the past eight months. The Government will examine each case individually before any action is taken.

The Government proposes to bargain for the release of Shaikh Mujib in exchange for the Pakistan Army officers and civilians who have surrendered.

The war has left damage and destruction everywhere and the ministers are in the unenviable position of beginning almost entirely from scratch. Except for the aid and loans so far promised by India, almost everything from rice to consumer goods, to iron and steel, will have to be imported.

A skeleton central administration was set up in Dacca today with about a dozen experienced civil servants under Mr Ruhul

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ডা. সারওয়ার আলী, *ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর*

গতমাসে মুক্তিযুদ্ধ বার্তা প্রকাশের পর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কয়েকজন প্রিয় মানুষকে হারিয়েছে। তাঁরা এসেছেন কর্ম ও জীবনের নানা ক্ষেত্র থেকে, তাদের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সম্পদ নিয়ে; তাদের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কার্যক্রম সমৃদ্ধ হয়েছে।
আমরা তাদের স্মরণ করি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়।

কর্নেল (অব.) শওকত আলী

(১৯৩৭-২০২০)

শওকত আলী আইন বিষয়ে স্নাতক হয়ে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের বৈষম্যমূলক আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে কয়েকজন দুঃসাহসী বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাদে সাথে যুক্ত হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পরিকল্পনা করেন। তারা বঙ্গবন্ধুর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সেনা ছাউনিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বাধীন দেশের জন্ম হবে। তাঁর রচিত গ্রন্থের ভাষায় এটি ছিল বাংলাদেশের প্রথম সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা। কিন্তু এই পরিকল্পনা সামরিক বাহিনীর নজরে পড়ে এবং ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামী করে তাদের গ্রেফতার করা হয় ও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। ক্যাপ্টেন শওকত আলী ছিলেন এই মামলার ২৬ নং অভিযুক্ত আসামী। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মুখে পাকিস্তানের শাসকরা এই মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ সকল অভিযুক্তকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তবে শওকত আলীকে চাকরি থেকে অবসর প্রদান করা হয়। একাত্তরের গণহত্যা সূচনার পর নরসিংদি ও রায়পুরায় তিনি ছাড়াও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অপর অভিযুক্ত কমান্ডার আব্দুর রউফ ছাত্র ও তরুণদের অস্ত্র চালনার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি প্রশিক্ষক ও সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতার পর শওকত আলী ১৯৭২ সালে পুনরায় সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর এই সাহসী মুক্তিযোদ্ধাকে পুনরায় অবসর প্রদান করা হয়। এরপর শুরু হয় তাঁর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন। শরিয়তপুরের এই জনপ্রিয় নেতা ১৯৭৯ সাল থেকে ২০০৮ অবধি পাঁচবার জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দেন।

১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠার পর থেকে কর্নেল শওকত আলী আমাদের কার্যক্রমে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সকল অভিযুক্তকে সংগঠিত করেন। এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত এবং তাদের সকলের আলোকচিত্র মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাছে তুলে দেন। বিশেষ করে, সার্জেন্ট জহুরুল হকের ভ্রাতুস্পুত্রী নাজনিন হক মিমির সহায়তায় প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সম্পূর্ণ অসুস্থ হওয়ার পূর্ব অবধি তিনি প্রতিটিতে তাঁর সহকর্মীসহ উপস্থিত থেকেছেন এবং ষড়যন্ত্র মামলার বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস তুলে ধরে সকলকে উজ্জীবিত করেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর একজন বিশিষ্ট সুহৃদকে হারিয়েছে।

খন্দকার মুনীরুজ্জামান

(১৯৪৮-২০২০)

খন্দকার মুনীরুজ্জামান ষাটের দশকের শেষ প্রান্তে ছাত্র আন্দোলন থেকে বেড়ে ওঠা সাহসী যুবক, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, যিনি মধ্যবয়স থেকে আমৃত্যু দৈনিক সংবাদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

তিনি ঊসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেছে আর সে বছরই ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছে, সত্তুরের নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। ঊনসত্তরের আগস্ট মাসে যখন টিএসসিতে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় ইসলামী ছাত্র সংসদের কর্মীরা হামলা করে, তাদের রুখে দাওয়া প্রথম সারিতে ছিল সাহসী তরুণ মুনীরুজ্জামান। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি ছিলেন আগরতলায় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রানজিট ক্যাম্পের দায়িত্বে। বিজয়ের পর মুনীরুজ্জামান কমিউনিস্ট পার্টির ঢাকা মহানগর শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হয়। পাশাপাশি সাপ্তাহিক একতায় সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেয়। নব্বইয়ে দল বিভক্ত হলে মুনীরুজ্জামান দলত্যাগ করে এবং দৈনিক সংবাদের সম্পাদকীয় বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। আর্থিক অনটন সত্ত্বেও তিনি সংবাদের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন এবং পরে দৈনিক সংবাদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে গেছেন। মুনীরুজ্জামানের রাজনৈতিক ও সামাজিক বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ কেবল দৈনিক সংবাদের পাতায় নয়, টেলিভিশনের আলোচনায়ও প্রত্যক্ষ করা যাবে।

মুনীরুজ্জামান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অকৃত্রিম সুহৃদ। দৈনিক সংবাদের সম্পাদক বজলুর রহমানের মৃত্যুর পর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর 'মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতার জন্য বজলুর রহমান স্মৃতিপদক' প্রবর্তন করে। এই সংক্রান্ত জুরি বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন মুনীরুজ্জামান। প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে যুক্ত থাকায় সে প্রতি বছর ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিবেদনসমূহের বিচারকের দায়িত্ব পালন করে। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, মুনীরুজ্জামানের ভিন্নধর্মী মাধ্যমের সকল বিচার্য্য বিষয় সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান ও দক্ষতা রয়েছে।

মুনীরুজ্জামান অকালে প্রয়াত হলেন। করোনা সংক্রমন থেকে মুক্ত হয়েও অন্যান্য জটিলতায় তার তিরোধান ঘটেছে। সাংবাদিক জগত ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসীজনরা তাদের একজন স্বজনকে হারিয়েছে।

নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষক ৩৭তম ঢাকা বিভাগীয় নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে। সম্মেলনের শুরুতে প্রয়াত ট্রাস্টি আলী যাকেরের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পলান করা হয়। তারপর স্বাগত বক্তব্য ও শিক্ষক সম্মিলনের লক্ষ্য উদ্যেশ্য প্রদান করেন ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। স্বাগত বক্তব্য শেষে তিন জেলায় পালিত শিক্ষা কর্মসূচির উপর সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন সত্যজিৎ রায় মজুমদার। সারসংক্ষেপ উপস্থাপনা শেষে ট্রাস্টি ও প্রকল্প পরিচালক মফিদুল হক নতুন বাস্তবতায় জাদুঘরের কার্যক্রম ও শিক্ষক সম্পৃক্তি (বঙ্গবন্ধুর দিনপঞ্জি, অনলাইন প্রদর্শনী, বুলেটিন, ফেসবুক, ওয়ান মিনিট ফিল্ম ও প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য ইত্যাদি) বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করেন। সম্মেলনে

শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রত্যক্ষদর্শী মৌখিক ভাষ্য সংগ্রহের অভিজ্ঞতা বর্ণনা রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জের হাজী নূরউদ্দিন আহমেদ উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক রঞ্জন চক্রবর্তী। এছাড়া তিন জেলার নির্বাচিত শিক্ষক মো. জাকির হোসেন -অধ্যক্ষ, পাঁচরুখি বেগম আনোয়ারা ডিগ্রী কলেজ, আড়াইহাজার, মো. মতিনুল ইসলাম - পরিচালক, ক্যালিক্স প্রি-ক্যাডেট, নারায়ণগঞ্জ, দ্বীনবন্ধু রায় - প্রধান শিক্ষক, লেমুবাড়ি বিনোদা সুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয়, মানিকগঞ্জ, এস এম আমিনুল ইসলাম - অধ্যক্ষ, ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার আনসার ভিডিপি স্কুল এন্ড কলেজ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর বক্তব্য প্রদান করেন। নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের তিনটি আলোচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরুর পূর্বে ষষ্ঠ শ্রেণির শওকত ওসমানের তোলপাড় গল্প অবলম্বনে নির্মিত তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। তথ্যচিত্র প্রদর্শন শেষে তিনটি আলোচ্য বিষয় : ক. বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য সংগ্রহে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যায়, খ. ফেসবুক, অনলাইন সেমিনার, অনলাইন প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠানে নেটওয়ার্ক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা উপায় ও গ. শিক্ষা সহায়ক মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যায় তার উপর প্রতিষ্ঠান প্রধান ও নেটওয়ার্ক শিক্ষক মতামত প্রদান করেন। শিক্ষকদের আলোচনা শেষে সারসংক্ষেপ বক্তব্য প্রদান করেন পুরিন্দা কে এম সাদেকুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ কে এম মফিজুল ইসলাম।

নেটওয়ার্ক শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের আলোচনায় অনলাইন, অনলাইন প্রদর্শনী, প্রযুক্তি ব্যবহার, ম্যাসেঞ্জার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ওয়েবসাইটে শিক্ষনীয় ভিডিও আপলোড, ওয়েবসাইটে লিংকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সরাসরি ভাষ্য আপলোডের ব্যবস্থা করা, ফেসবুক পেইজ, ফ্রি-ব্রাউজ করার পদক্ষেপ, ফেসবুকে নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের গ্রুপ খোলা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা ও কুইজ, নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট সেম্পল তৈরি করে বাছাই করে ইউনিক প্রেজেন্টেশন তৈরি করা ও প্রতিটি বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণারে ভিডিও দেখানোর ব্যবস্থা করা এই সকল বিষয় গুলো আলোচনার মধ্যে উঠে এসেছে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আব্দুল হান্নান খান স্যার প্রয়াণে

আমেনা খাতুন, *কনজারভেটর এন্ড আর্কিভিস্ট*

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের কোঅর্ডিনেটর মুক্তিযোদ্ধা মো: আব্দুল হান্নান খান চলে গেলেন। জানিনা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে এমন নির্ভীক, আত্মপ্রত্যয়ী ও অকুতোভয় ব্যক্তিত্ব আছেন কি-না যে তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ, এই সাহসী মানুষটিকে ভালোভাবে জানার সুযোগ হয় সম্ভবত ২০১০ সাল থেকে একটি মহৎ কাজের মাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দি স্টাডিজ অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস-এর কোর্সে প্রতি বছর ক্লাস নিতেন তিনি। তাছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠানেও নিয়মিত আসা যাওয়া ছিলো।

দেখা হলেই বলতেন কি খবর সাহসী মেয়ে আমেনা?

ট্রাইব্যুনাল গঠনের পরপরই প্রথম যে চ্যালেঞ্জ ছিলো তা হলো লিগাল এভিডেন্স যোগাড় করা। সে ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর একটি বড় ভূমিকা পালন করে। যুদ্ধাপরাধের এভিডেন্স বহন করে এমন দলিল চিহ্নিত করার ও কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হয়, অর্থাৎ লিগাল এভিডেন্স হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হয়। জাদুঘর একটি লিগাল ভলান্টিয়ার টিম গঠন করলো এসকল বিষয় রিসার্চ করার জন্য। শুরুতে কয়েক বছর এই টিমের তদারকি ও রিসার্চ মেটেরিয়াল স্টাডি করে বুঝতে পারি যে লিগাল এভিডেন্স কি। পরবর্তীতে হংকং ইউনিভার্সিটিতে আর্কাইভাল স্টাডিজ এ পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স করার সময় হিস্টোরিক ডকুমেন্টস এন্ড হিউম্যান রাইটস ইস্যু সম্পৃক্ত দলিল কি করে শনাক্ত করা যায় ও এর উপস্থাপন কৌশল রপ্ত করতে শুরু করি। আইসিটিবিডি গঠনের পর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তথ্যভাণ্ডার এক বিশাল ভূমিকা পালন করে। জাদুঘরের আর্কাইভ প্রধান হিসেবে লিগ্যাল এভিডেন্স সনাক্ত করতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। টানা পাঁচ বছর রেগুলার বেসিসে এ কাজটি করতে হয়েছে। এরপর শুরু হয় স্বাক্ষী দেয়ার পালা। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমার প্রথম স্বাক্ষ্য প্রদানের আগে স্যার আমাকে ফোন করে বললেন আমেনা তোমাকে যে একটু স্বাক্ষী দিতে আসতে হয় মা? কিছুই না তোমাকে খুব বেশী হলে ৫ মিনিট জিজ্ঞেস করবে। একেবারে বুক ফুলিয়ে কথা বলবা। আমিও সরল মনে তাই বিশ্বাস করলাম। কিন্তু কেন ২ দিনের মধ্যে ৩-৪ বার ফোন করেছেন ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় উঠে বুঝলাম যে বিষয়টি এত সহজ নয়। ১ ঘণ্টার মতো জেরা করেছে। আমার যা বুঝবার আমি বুঝে গেলাম। সে সময় হুমকি, টেলিফোনে থ্রেড, ছোট বোন কে জীবন নাশের বার্তাসম্বলিত মেসেজসহ নানান বিড়ম্বনা।

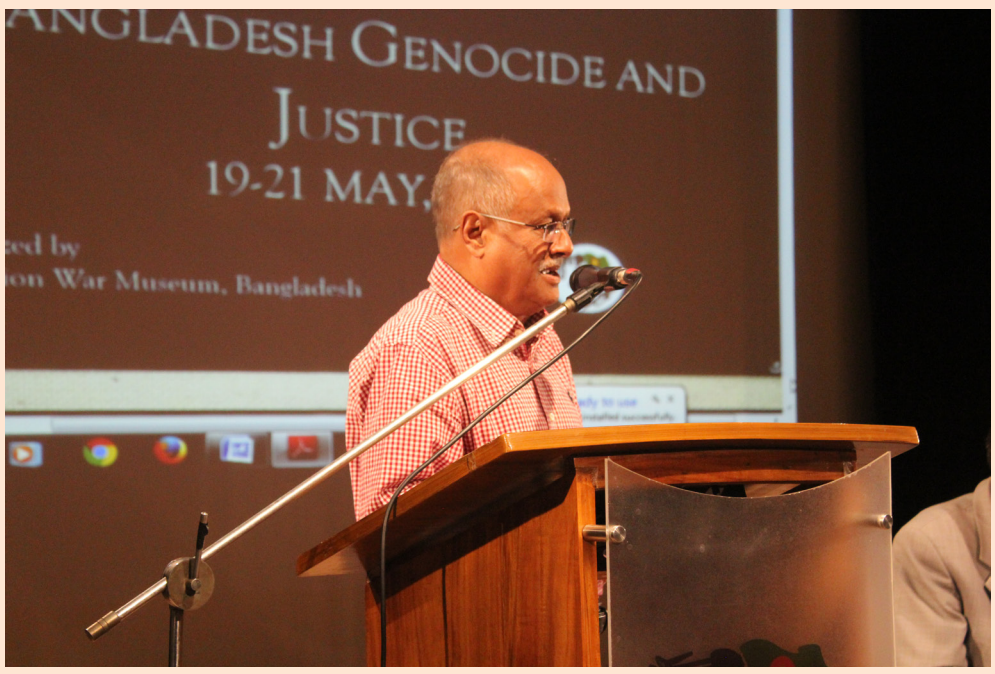

সম্ভবত আমি এবং আরেকজনের নাম মনে নেই সর্বোচ্চ স্বাক্ষ্য দাতা। যতবার আমার স্বাক্ষ্য দেয়ার প্রয়োজন পরতো স্যার নিজে ফোন করতেন আগে, তারপর ইনভেস্টিগেটর দের পাঠাতেন। মনোয়ারা বেগম আপা ও আব্দুর রাজ্জাক ভাইসহ অনেক ইনভেস্টিগেটর অফিসার এর অধীনে কেইসের স্বাক্ষী ছিলাম আমি।

স্যারের সাথে যাদের আড্ডার সুযোগ হয়েছে তারা জানেন তিনি কতটা আমুদি এবং মাতিয়ে তুলতে পারেন। একদিন জাদুঘরে একটি প্রোগ্রামে এলেন, তবে ২ ঘন্টা আগে। একজন ফোন করে জানালেন স্যার আগে আসবেন আমার সাথে বসবেন। যথারীতি স্যার এলেন। এবং সেটি কাজের উদ্দেশ্যেই। এটা উনার একটি কৌশল। শিখেছি আমিও। বেশ ফলপ্রসূ। যাই হোক, তাঁর অতি পরিচিত মিষ্টি মিষ্টি কথার মাঝে আমি জিজ্ঞেস করে ফেললাম। স্যার আপনি যে বলছিলেন আমাকে স্বাক্ষী দিতে, তেমন কিছু জিজ্ঞেস করবেনা, বড়জোর ৫ মিনিট। আসলেই কি স্যার ৫ মিনিটে হওয়ার কথা কথা শেষ না হতেই একটা দুষ্টু-মিষ্টি হাসি দেখা যায় স্যারের মুখাবয়বে। শেষে হেসেই দেয়, আরে না, 'তুমি তো সাহসী মেয়ে আমি জানতাম তোমাকে আটকাতে পারবেনা।' সেদিন বিচার, চোর ডাকাত, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জীবনে কতজনের কতরকম হাসির ঘটনা বলে গেলেন।

অত্যন্ত সামাজিক উদার ও আমুদি একজন মানুষ। ঈদসহ যেকোনো জাতীয় দিবসে শুভেচ্ছা পাঠাতেন নিয়ম করে। আমার ধারণা তাঁর পরিচিত সকলকেই পাঠাতেন। মুক্তিযোদ্ধা দেশপ্রেমিকের সাথে এই মহৎ কাজ নিয়ে অনেক কিছু লেখা যায়। মানুষের জানা উচিৎ কত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আপনি যুদ্ধাপরাধ বিচারকার্য চালিয়ে গেছেন। শুধু আর্থিক অপর্যাপ্ততা নয়, স্বাক্ষী উধাও থেকে শুরু করে, তথ্য যোগারের প্রতিবন্ধকতা। আর এগুলো সফল করার ক্ষেত্রে আশাহত না হয়ে কি করে আপনার সংস্থার সদস্যদের মনোবল চাংগা রেখে কাজ চালিয়ে গেছেন সেই কৌশল শিখবার আছে। নতুন প্রজন্মের আপনাদের সম্পর্কে জানতে হবে, চেষ্টা করবো জানাতে। আপনি বেঁচে থাকবেন কাজের মাধ্যমে। ওপারে শান্তিতে থাকুন স্যার আমিন।

স্মৃতিতে আব্দুল হান্নান স্যার

সদ্যপ্রয়াত জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান খান (পিপিএম) তাঁর জীবদ্দশায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, বাংলাদেশের ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। একজন ইনভেস্টিগেটরহিসেবে ট্রাইব্যুনালে তার পরিচিতির পাশাপাশি সিএসজিজে কর্তৃক আয়োজিত মাসব্যাপী উইন্টার স্কুলে তাঁর সরব উপস্থিতি ছিল। আমাদের সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধার এই মানুষটিকে হারিয়ে আমরা ব্যাথিত।

সদালাপী ও হাসিখুশি এই মানুষটির কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই জেনেছি, বুঝেছি ও শিখেছি। ট্রাইব্যুনালের মামলা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে তদন্ত বা ইনভেস্টিগেশন, আর এই বিষয়ে কাজের ধারা ও প্রতিবন্ধকতাগুলো অকপটে আমাদের সাথে শেয়ার করতেন। সেই সাথে জানতেন বাংলাদেশের অপার সম্ভবনার কথাও। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে সখ্যতা ছিল তাঁর বেশ আগ থেকেই। আর সেন্টারের পথচলা যখন শুরু হয় ২০১৪ সাল থেকে, একে একে প্রায় প্রতিটি আয়োজনেই হান্নান স্যার স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিতেন। তরুণ প্রজন্মকে জানাতেন দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা।

তিনি মূলত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিভিন্ন দিক ও প্রধান তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা বিষয়েই ক্লাস নিতেন। কর্মজীবনে বাংলাদেশ পুলিশের হয়ে কাজ করার দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি প্রধান তদন্তকারী কর্মকর্তার মতো গুরুতপূর্ণ এক পদে ট্রাইব্যুনাল স্থলাভিষিক্ত হয়ে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ১৯৭১ সালের গণহত্যার শিকার বাঙালিদের শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন ও হত্যার বর্ণনা ও অন্যান্য খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করাই ছিল তাঁর কাজ। শুধু তাই নয়, প্রসিকিউটর বা রাষ্ট্রের কৌশুলীদের সাথে এই ঘটনাগুলোর সাথে আন্তর্জাতিক অপরাধের সম্পৃক্ততা তুলে ধরার কাজটুকুতেও তিনি অংশ নিয়েছেন।

ইনভেস্টিগেটর হিসেবে তাঁর প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে মূলত মনে হয়েছে দীর্ঘ সময়ের ব্যাপ্তিতে বয়ানকারী স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া কিংবা প্রতিবন্ধকতা। তারপরও বাধা পেরিয়ে বিভিন্ন মামলার কাজে নিরলসভাবে তদন্ত সংক্রান্ত কাজ করে গেছেন। মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান খান, সদালাপী এই গুণীজনের প্রতি রইল অসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

নওরিন রহিম
কো-অর্ডিনেটর, সিএসজিজে

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদদের শোকবার্তা

I just saw on your Facebook page that Hannan has left us.... another sad loss to coronavirus of those fighting for justice. Oh, I remember so many occasions shared with that so irrepressible and zany personality-- whether sharing a lunch of hilsa in his office, an evening at the Utara Club or arguing stridently about this or that strategy or tactic, always accompanied by his lively reminiscensces of past derring-do (both adventures and misadventures) Please do add my name and message if there is a condolence book for him.

Helen Jarvis
Cambodia

I find no consolation for this terrible news. First our dear Tariq Ali and now the dear and joyous Hannan Khan. It is truly a sadness for which I will have no consolation. The only thing that makes me happy is to have seen him in November, we were able to share a pleasant moment talking and having tea at the Pan Pacific.
He and the rest will be greatly missed, not only for their quality as human beings but for their enormous work for memory, truth and justice in Bangladesh. These losses are losses for all humanity.

Best wishes,
Irene Victoria Massimino
Argentina

ভুলি নাই শহীদের কোন স্মৃতি/ ভুলব না কিছুই আমরা

১৯৭১ সালের দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে অগণিত মানুষ জীবন উৎসর্গ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মাসিক মুখপত্র 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা'য় মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রতি মাসে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহ হতে গ্যালারিতে প্রদর্শিত ঘটনার পাশাপাশি আর্কাইভে সংরক্ষিত স্মারকের (স্থানাভাবে যেগুলো গ্যালারিতে প্রদর্শন সম্ভব হচ্ছে না) উপস্থাপন অব্যাহত রাখার চেষ্টা রয়েছে।
বিজয়ের মাস ডিসেম্বর, এই মাসে জাতি হারিয়েছে শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। আত্মদানকারী ক'জন বুদ্ধিজীবীর ত্যাগের ঘটনা এবং স্মৃতিচিহ্ন তুলে ধরা হলো 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা'র এবারের সংখ্যায়।

অধ্যাপক আবুল হাসেম মিয়া (১৯৪০-১৯৭১)

আবুল হাশেম মিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে সম্মানসহ এম এ পাশ করেন। পরে আইনে এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। মেজর এটিএম হায়দারের নেতৃত্বে পরিচালিত ২ নং সেক্টর কমান্ডারের অধীনে বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলকে মুক্ত করার পর ৭ ডিসেম্বর সকালে মাইজদী কোর্টে রাজাকারের চোরাগুলিতে তিনি শহীদ হন।

আবুল হাসেম মিয়ার ব্যবহৃত টর্চ
দাতা: আব্দুল্লাহ্ শিবলী

সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন (১ মার্চ ১৯২৯-১০ ডিসেম্বর ১৯৭১)

সিরাজুদ্দীন হোসেন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন তিনি 'প্রকান্তরে' পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে লিখেন। ১০ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দোসর আল-বদররা তাঁকে শান্তিনগরের চামেলী বাগের বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। তাঁর আর কোন সন্ধান মেলেনি।
সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনের হাতের লেখা এবং বই 'ইতিহাস কথা কও'
দাতা: শাহীদ রেজা নূর

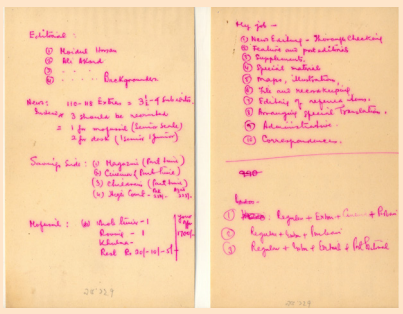

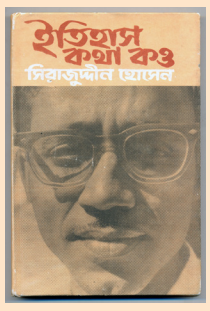

ডা. মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি

(২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ - ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১)
প্রফেসর, ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এন্ড কার্ডিওলজি
ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

ডা. ফজলে রাব্বি বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় ছিলেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। ১৫ ডিসেম্বর আল-বদরের সদস্যরা তাঁকে বাসা থেকে তুলে আরো অনেক বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে রায়ের বাজার ইটখোলায় নৃশংসভাবে হত্যা করে।

ডা. ফজলে রাব্বির গাড়ি, শার্ট ও রক্তচাপ মাপারযন্ত্র। ডা. রাব্বি এই গাড়িতে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের বহন করেছেন, যুগিয়েছেন তাঁদের ওষুধপত্র
দাতা: ড. জাহানারা রাব্বি ও প্রফেসর নাসরীন সুলতানা

শহীদ বদিউজ্জামান, শহীদ করিমুজ্জামান ও শহীদ শাহজাহান

কুমিল্লার মন্দভাগ এলাকায় যুদ্ধরত ছিলেন তিন ভাই বদিউজ্জামান, করিমুজ্জামান ও শাহজাহান। মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে বড় ভাই বদিউজ্জামান তাঁদের ৯৮, রামকৃষ্ণ মিশন রোডের বাড়িটি পরিণত করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটিতে। ১০ ডিসেম্বর ভোর রাতে ছোট দুই ভাই বড়ভাই ও অন্যদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ১৩ ডিসেম্বর আলবদর বাহিনী তাঁদের ধরে নিয়ে যায় এবং পরে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে পাওয়া যায় তিন ভাইয়ের লাশ।
দাতা : তুরানুজ্জামান

Bengal's elite dead in a ditch

By Nicholas Tomalin, Dacca

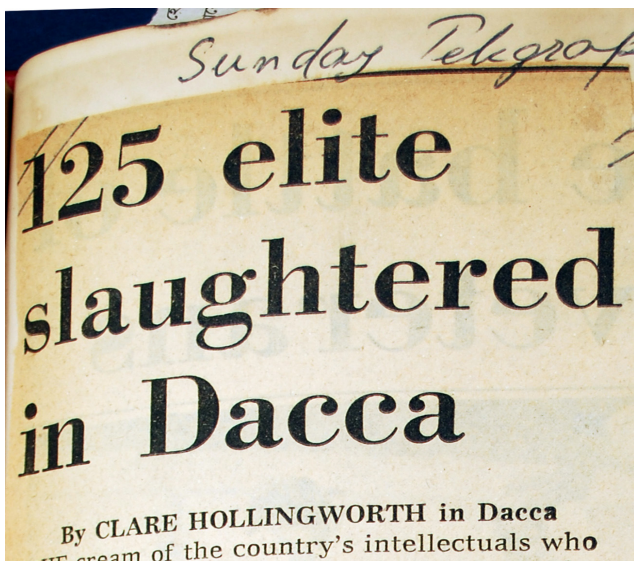

Daily Express Dec. 17, 1971

CASUALTIES OF WAR

AMID the wreckage of battle in Bangla Desh lies a host of illusions. They too are casualties of war.

The United States has discovered that, despite the immense aid she has lavished on India for a generation, she has been unable to influence Mrs. Gandhi's policy to the slightest degree. So ends the dream that money buys loyalty.

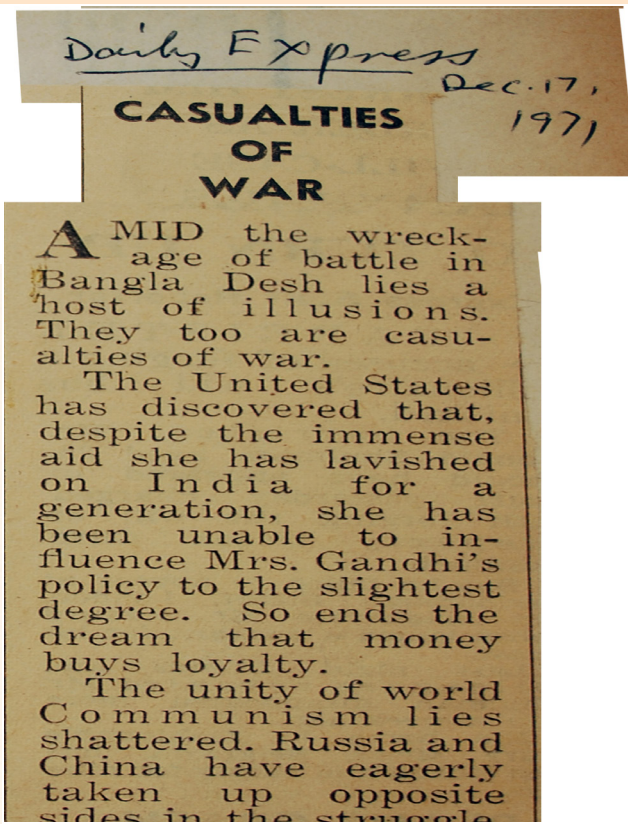

The unity of world Communism lies shattered. Russia and China have eagerly taken up opposite sides in the struggle

Sunday Telegraph

125 elite slaughtered in Dacca

By CLARE HOLLINGWORTH in Dacca

...cream of the country's intellectuals who

Mukti Bahini guerrillas in a brickyard where they discovered the bodies of about 200 people massacred before the fall of Dacca.

‘গ্লোবাল সাইটস অব কনসাইন্স মিটিং ২০২০’ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

ফজলে রাব্বী

ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব সাইট অব কনসাইন্সের আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক ৭ থেকে ১১ ডিসেম্বর ‘গ্লোবাল সাইটস অব কনসাইন্স মিটিং ২০২০’ আয়োজন করে। সভার প্রতিপাদ্য ছিল: ডকুমেন্টেশনের নতুনধারা: সমাজ-নির্ভর তথ্য সংগ্রহ উদ্যোগ” (ট্রান্সফরমেটিভ ডকুমেন্টেশন: নিউ এপ্রোচ টু কমিউনিটি-ড্রিভেন ডকুমেন্টেশন ইনিশিয়েটিভ)। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বৈশ্বিক সভাটি আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল। তবে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির জন্য শেষ অবধি ভার্চুয়ালভাবে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সভা আয়োজনের প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার স্বীকৃতি স্বরূপ পাঁচদিনব্যাপী সভায় ঢাকা সময় অনুসরণ করা হয়। পাশাপশি সভায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ডিজিটাল সফরের ব্যবস্থা রাখা হয়। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আইসিএসওসির সদস্য ও সহযোগী বিভিন্ন জাদুঘর, আর্কাইভ, মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধিরা সভায় যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ডিসপ্লে ও আর্কাইভ বিভাগের প্রধান আমেনা খাতুন, মো. ফজলে রাব্বি ও তরুণ কর্মীরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে সভায় অংশ নেন। আইসিএসওসি-এশীয় নেটওয়ার্কের পরিচালক সিলভিয়া ফার্নান্দেজ উদ্বোধনী অধিবেশনে স্বাগত ভাষণ ও সমাপনী অধিবেশনে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পাশপাশি মুখ্য সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সাথে আইসিএসওসির কর্মকর্তা ডরিও কোলমেনারেস, প্রতিমা নারায়ণ এবং জিজি লেন জোসেফ বিষয়ভিত্তিক অধিবেশনসমূহ সঞ্চালনা করেন। সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্ট্রি মফিদুল হক কক্সবাজার থেকে ভাসান চরে রোহিঙ্গাদের সম্মতিক্রমে স্থানান্তর নিয়ে অপপ্রচার বিষয়ে সচেতন থাকার আহবান জানান। তিনি এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ ও বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আহবান জানান। তিনি জাতিসংঘের বর্ণবাদী বৈষম্য নিরোধ বিষয়ক কমিটির র‍্যাপোটিয়ার রিটা আইজ্যাক নাদিয়ে সভার মূল আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। রিটা আইজ্যাক তাঁর বক্তব্যে ব্যক্তি ও পেশাগত জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈরিতা ও বৈষম্য তুলে ধরেন। তিনি সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষায় ছয়টি মূলনীতি অনুসরণের পরামর্শ দেন। তিনি আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহেরে মধ্যে আরো জোরদার সম্পর্ক কামনা করেন। তাঁর মতে, সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি হচ্ছে, ‘ভালবাসা নিছক অনুভূতি নয়, এটা হচ্ছে ক্রিয়া।’ তিনি তাঁর বক্তব্যের ইতি টানেন এই বলে, ‘জাতিসংঘ আপনাদের মত সংগঠন ও সংগঠকদের কাছ থেকে বিশ্বের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে শুনতে ও বুঝতে চায়।’

প্রথম প্যানেল অধিবেশনে জার্মানি, সিরিয়া, কলম্বিয়ার তিন সংগঠন ‘বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লঙ্ঘন তথ্যভুক্তি’ শিরোনামে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ উপস্থাপন করেন। দ্বিতীয় প্যানেল অধিবেশনে চিলি, আফগানিস্তান, লেবানন এবং ভারতের (তিব্বত) চার সংগঠন ‘স্মৃতি সংরক্ষণ’ শিরোনামে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরেন। পাবলিক ইন্টারন্যাশনাল ল’ এন্ড পলিসি গ্রুপের (পিআইএলপিজি) নিখিল নারায়ণ এবং মিলেনা স্টেরিও সভায় অংশগ্রহণকারীদের দুইদিনব্যাপী ‘সমাজ-নির্ভর ডকুমেন্টেশন’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসের সমন্বয়কারী নওরিন রহিম বাংলাদেশে রোহিঙ্গা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহে এশীয় নেটওয়ার্কের সাথে যৌথ কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। ডরিও কোলমেনারেস, পিআইএলপিজির কেট গিবসন ও এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটসের পিয়া কনরাডসেন রোহিঙ্গা বিষয়ক তিনটি উপস্থাপনা পেশ করেন। রাধিকা হেতিআরাচচি (শ্রীলঙ্কা) এশিয়া অঞ্চলের নেটওয়ার্ক পরিচালিত ‘আমাদের যৌথ অভিযাত্রা’ শিরোনামের প্রদর্শনী প্রকল্পের বিস্তারিত দিক তুলে ধরেন। এশিয়া অঞ্চলের নেটওয়ার্কের সদস্যবৃন্দের ভবিষ্যৎ রূপকল্প নির্ধারণ করার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

বঙ্গবন্ধুর পদচ্ছাপ, প্রাপ্ত শেষ তথ্য

’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ফলে তথাকথিত ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা’ থেকে মুক্তি লাভ করেন বঙ্গবন্ধু। তিনি ২২ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান। জেল থেকে বেরিয়ে এসে বিভিন্ন জেলায় সাংগঠনিক সফরে বের হন তিনি। যশোরে আসেন ৩০ আগস্ট। তাঁকে যশোর বিমান বন্দরে গিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। সিঁড়ি বেয়ে যখন তিনি নামছেন তাঁকে দেখামাত্র আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল মনে। মনে হল এ যেন এক পরম পাওয়া। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মোশাররফ হোসেন (তিনি এলএলবি মোশাররফ হোসেন নামে অধিক পরিচিত ছিলেন) সাথে অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতারা গিয়েছিলেন বিমান বন্দরে। আমরাও গিয়েছিলাম একই সাথে। জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন শেখ আ. সালাম, সাধারণ সম্পাদক খান টিপু সুলতান এবং সহসাধারণ সম্পাদক ছিলাম আমি।

বঙ্গবন্ধু যশোর সড়ক ও জনপথের বাংলোতে উঠেছিলেন। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করার পর কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যার সময় এডভোকেট মোশাররফ সাহেবের বাড়িতে যান। মোশাররফ সাহেবের মা-এর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করেন। ঐ বাড়িতে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন, সকলের কুশলাদি জানতে চান। বঙ্গবন্ধু এসেছেন শুনে অনেকে বাড়ির সামনে এসে জমা হন তাঁকে এক নজর দেখার জন্য।

সন্ধ্যার পর তিনি দড়াটানা মোড়ে অবস্থিত আলী মঞ্জিলে জেলা আওয়ামী লীগের অফিসে যান। সেখানে নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট আইনজীবী মশিউর রহমান ও রওশন আলী সাহেব ওখানে এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

সন্ধ্যার পর বঙ্গবন্ধুকে পৃথকভাবে ছাত্রলীগের পক্ষ থকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুকে এত কাছে পেয়ে আমাদের সে কী আনন্দ। এক অনির্বচনীয় সুখানুভূতিতে আমরা আবিষ্ট হয়ে রইলাম। আমাদের পক্ষ থেকে জেলা ছাত্রলীগ নেতা অশোক কুমার রায়ের পেন্সিলে আঁকা দু’টি ছবি বঙ্গবন্ধুকে উপহার দেয়া হল। একটি ছিল বঙ্গবন্ধুর অন্যটি জাতীয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর। ছবি দু’টি দেখে বঙ্গবন্ধু আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং অশোক রায়কে বুকে টেনে নিয়ে ১০০ টাকা উপহার দিয়েছিলেন।

তথ্য প্রেরণকারী : *প্রদীপ কুমার রায়, সিনিয়র শিক্ষক, সম্মিলনী ইনস্টিটিউট, যশোর ও নেটওয়ার্ক শিক্ষক , মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর*

বঙ্গবন্ধু কালপঞ্জি : নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের তথ্য প্রেরণের আবেদন

গত জুলাই মাসে নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আবেদন জানিয়েছিল তাদের স্ব স্ব জেলায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আগমন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে প্রেরণের জন্য। সেপ্টেম্বর ও নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ৪টি নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মেলনে শিক্ষকরা এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে আগ্রহ প্রকাশ করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আনন্দের সঙ্গে জানচ্ছে যে ইতোমধ্যে ৩৩টি জেলার প্রায় আশিটি বিদ্যালয়ের নেটওয়ার্ক শিক্ষকবৃন্দ তাদের সংগৃহীত তথ্য পাঠিয়েছেন। আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা সেই সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের প্রতি। যে সকল জেলা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এখনও তথ্য পাওয়া যায়নি, তাদের কাছে দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করে জাদুঘরের পাঠানোর আবেদন জানাচ্ছি। আশা করছি আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতায় জাদুঘরের তথ্য ভান্ডার সমৃদ্ধ হবে এবং মুজিব শতবর্ষে জাতির পিতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা যাবে।

তথ্য প্রাপ্ত-জেলার তালিকা

১. পিরোজপুর
২. গাইবান্ধা
৩. চট্টগ্রাম
৪. চাঁপাইনবাবঞ্জ,
৫. বরগুনা
৬. মৌলভীবাজার
৭. ময়মনসিংহ,
৮. ব্রাহ্মণবাড়িয়া,
৯. রংপুর,
১০. ঝালকাঠি,
১১. নোয়াখালী
১২. লক্ষীপুর
১৩. কুড়িগ্রাম
১৪. পটুয়াখালী
১৫. ফরিদপুর
১৬. টাঙ্গাইল
১৭. পঞ্চগড়
১৮. চাঁদপুর
১৯. রাঙ্গামাটি
২০. সিলেট
২১. নাটোর
২২. বগুড়া
২৩. কক্সবাজার
২৪. বরিশাল
২৫. দিনাজপুর
২৬. রাজশাহী
২৭. নীলফামারী
২৮. চুয়াডাঙ্গা
২৯. মাদারীপুর
৩০. ভোলা
৩১. সাতক্ষীরা
৩২. মাগুরা
৩৩. চাঁদপুর

হামার মরণ হয় জীবনের মরণ যে নাই...
মাটিতে মিশিয়া যায় মাটির শরীর...
মাটি হতে জন্ম নেয় আবার শরীর...
মাটিতে সন্তান মোর উঠিয়া দাঁড়ায়।

২৭ নভেম্বর ২০২০, আবারো এক বিষাদের কালো মেঘে ছেয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। করোনা মহামারীর আঘাত আবারো এলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবারে। সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি জিয়াউদ্দিন তারিক আলী প্রয়াত হন করোনা আক্রান্ত হয়ে। অল্প সময়ের ব্যবধানে নভেম্বর মাসে সেই করোনা আক্রান্ত হয়েই চলে গেলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি আলী যাকের। জীবন মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন একাত্তরের শব্দ সৈনিক, বাংলা নাটকের অন্যতম পথিকৃৎ, বরেণ্য অভিনেতা-নাট্য-পরিচালক, সংস্কৃতিজন। তিনি রয়ে যাবেন তাঁর সকল কর্মে ও আদর্শে। তিনি থাকবেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সকল কাজের মধ্যে। ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় স্মরণ করি তাকে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জিয়াউদ্দিন তারিক আলী, সারা যাকের, আলী যাকের, ডা. সারওয়ার আলী, মফিদুল হক, আক্কু চৌধুরী এবং সর্ব ডানে ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর

ট্রাস্টি আলী যাকের : বটবৃক্ষের ছায়া ও আশ্রয়

মফিদুল হক
ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

দীর্ঘদেহী সুদর্শন ব্যক্তি তিনি, গড়পরতা বাঙালির চেয়ে অনেক বড়, আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে, দেহের গড়নে ও মনের ধরনে। বিগত ২৭ নভেম্বর জীবনমঞ্চ থেকে তাঁর প্রস্থানের পর নানা মানুষের নানা ধরনের আকুতিতে ফিরে ফিরে আসছে এক উপমা, বটবৃক্ষ, অনেকের জন্য তিনি ছিলেন বটবৃক্ষের মতো, এর চেয়ে উপযুক্ত আর কেনো উপমা তাঁর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্যও স্বভাবগতভাবে তিনি ছিলেন তাই, শুরুরও আগের যে শুরু, সেই সময়ে যেমন, ঠিক তেমনি জীবন-উপান্তে এসেও। এই ভূমিকা তিনি যে সরবে সদম্ভে পালন করেছেন তা নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের সুষমাই তাঁকে সহজাতভাবে এমন অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেছিল। ১৯৯৬ সালের ২২ মার্চ সেগুনবাগিচার স্বপ্নসম সাবেকী গৃহে যখন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যাত্রা শুরু করে সে-দিন ছিল আবেগমথিত এক ক্ষণ, তবে তারও প্রায় এক বছর আগে থেকে শুরু হয়েছিল প্রস্তুতি, যখন আমরা ঘনিষ্ঠজনেরা মিলিত হতাম ঘন ঘন, এর ওর বাড়িতে, তখন আলী যাকেরের বাসা হয়ে উঠেছিল নির্ভরতা, প্রেরণা ও আনন্দের উৎস। কোনো দপ্তর ছিল না জাদুঘরের, জাদুঘরই তো তখন ছিল না, ছিল কেবল আকাঙ্ক্ষা, প্রতিবারের মিলন-সভার পর সেই আকাঙ্ক্ষা হয়ে ওঠে আরো দৃশ্যমান। গঠিত হয় ৮-সদস্যের ট্রাস্টিবোর্ড, অনেক আলোচনা-বিবেচনার পর। তারপর যখন তেজগাঁও রেজিস্ট্রারের এজলাসে লাল সালু-ঘেরা কাঠের পাটাতনে দাঁড়িয়ে নিজেদের পরিচিতি দাখিল করে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হলো 'মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি ট্রাস্ট', উদ্যমী চির নবীন আক্কু চৌধুরীকে সদস্য-সচিব করে, তখন মনে হয়েছিল এবার আর পিছু ফেরার কিংবা স্বপ্ন বিসর্জনের সুযোগ নেই। সেই দিন সরকারি দপ্তরে কিংবা পরে এরূপ বিভিন্ন কাজে যখনই কারো দ্বারস্থ হওয়া গেছে সেই দুঃসময়েও মানুষ যেভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তা' ছিল বিপুল প্রেরণার উৎস। মনে পড়ে সেদিনও তেজগাঁও সরকারি দপ্তরে আলী যাকেরের উপস্থিতি পাল্টে দিয়েছিল পরিবেশ, তারপর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে কতভাবেই-না তাঁর ব্যক্তিত্ব সুশীতল ছায়া বিস্তার করে চলেছে।

জাদুঘর যখন শুরু করলো স্মারক সংগ্রহের কাজ তখন যাকের ভাই খুঁজে পেতে এনে দিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের যুদ্ধ-সাংবাদিক হিসেবে তাঁর পরিচয়-পত্র। এর বাইরে যুদ্ধকালে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে তিনি কখনো বিশেষ কিছু বলেন নি, পশ্চিমবাংলার বিশিষ্ট বামপন্থি বুদ্ধিজীবী লেখক দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা সর্বজনশ্রদ্ধেয় চিকিৎসক নৃপেন সেনের সঙ্গে তাঁর ছিল বিশেষ হৃদ্যতা। সেসব কথা কিছু জেনেছি তাঁদের কাছ থেকে, তিনি কখনো কিছু বলেন নি। একবার জাদুঘরের কোনো এক অনুষ্ঠানে সমবেত করা হয়েছিল জহির রায়হানের যুগান্তকারী প্রামাণ্যচিত্র 'স্টপ জেনোসাইড'-এর সঙ্গে যুক্ত কলাকুশলীদের, সেবারই যাকের ভাই জানালেন, চলচ্চিত্রের ইংরেজি ধারাভাষ্য পাঠ করেছিলেন আলমগীর কবির, অনুবাদের কাজে তাঁকে সহায়তা করেছিলেন তিনি এবং ছবিতে নাটকীয়ভাবে বারবার যে-উচ্চারিত হয় 'স্টপ, স্টপ', সেই কণ্ঠটি আলী যাকেরের। এভাবেই তো বহু মানুষের বহু ধরনের ভূমিকা ও অবদানে অপরাজেয় হয়ে উঠেছে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ, তা' কোনো স্বীকৃতি বা আনুষ্ঠানিক সনদ দাবি করে না, বেঁচে থাকে মহাস্রোতের বহমান কল্লোল, সমবেত গান, জাতির অর্কেস্ট্রার মূর্চ্ছনা, যার ব্যাটন একজনের হাতে, যিনি অনেক মহড়া ও অধ্যবসায়ে তৈরি করেছিলেন জাতীয় বাদনদল, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আবার এটাও এক বাস্তব, কোথাও স্বীকৃতি কিংবা নামোল্লেখ না থাকলেও 'স্টপ জেনোসাইড' বার্তা পরম তীব্রতা নিয়ে ছবিতে যখন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় তখন আলী যাকেরকে আমরা সেখানে খুঁজে পাই, যে-কণ্ঠ সবাইকে ছাপিয়ে প্রকাশ করে জাতির আকুতি।

মুক্তিযুদ্ধ অব্যাহত ছিল আলী যাকেরের ক্ষেত্রে, নানা দিকে নানাভাবে। মঞ্চে তিনি শিল্পের যে-রূপ ফুটিয়ে তুললেন সেটাও তো মুক্তির চেতনা বিস্তারের আরেক রূপ, তিনি যে সমার্থক হয়ে উঠলেন বিস্মৃত জনসমষ্টির মুক্তিদাতা নেতা নূরুল দীনের সেটাও পেয়েছিল প্রতীকী ব্যঞ্জনা।

আলী যাকেরের উপস্থিতি তাই ছিল আশীর্বাদসম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রয়াসে। কত কথা কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে জাদুঘরের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের সঙ্গে। আমার বিশেষভাবে মনে

এরপর ১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

আমার পিতৃতুল্য বন্ধু

আসাদুজ্জামান নূর, *ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর*

১৯৭১ সালের শেষের দিকে। তখন আমি চিত্রালী নামে একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিকীতে কাজ করি। চিত্রালী সম্পাদক এসএম পারভেজ আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট দিলেন আলী যাকেরের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য। তখন পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। যদিও তার বাড়িতে একবার গিয়েছিলাম সংস্কৃতি সংসদের 'মুক্তধারা' নাটকে অভিনয়ের প্রস্তাব নিয়ে। গিয়ে দেখি তার প্রচণ্ড জ্বর। আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অভিনয় করতে পারলেন না। সম্ভবত মতি ভাই, হাসনাত ভাই সবাই মিলে গিয়েছিলাম। আমাকে মনে থ াকার কথা নয়।

ইস্ট এশিয়াটিক অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেড, মতিঝিলে করিম চেম্বার। বাংলাদেশ বিমান অফিসের পাশে। তিনি এ কোম্পানির বড় কর্মকর্তা।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ডাক পড়ল। ঢুকে দেখলাম, এক বিশাল টেবিলের সামনে বসে আছেন বিশালদেহী মানুষ- আলী যাকের। বললেন, বসুন। চা, না কফি? ভাবলাম, কফি তো সহজে জোটে না। কফিই খাই (হয়তো জীবনে এটাই প্রথম কফি খাওয়া)। সাক্ষাৎকার শেষে বললেন, আমরা টিকিট বিক্রি করে নিয়মিত নাটক করার পরিকল্পনা করেছি। মহড়াও শুরু করেছি। দেখতে আসুন একদিন। ঠিকানা নিয়ে রাখলাম। এক দিন গেলাম রিহার্সালে, সন্ধ্যাবেলায়। নাটকের নাম 'বাকি ইতিহাসৎ। নাট্যকার বাদল সরকার। ওখানে গিয়ে দেখি বেশ কজন পূর্বপরিচিত। স্বাধীনতার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে যেসব নাটক হয়েছিল, সেখানেই তাদের সঙ্গে চেনাজানা। তারা সবাই বলে উঠলেন, এই তো, প্রম্পটার পাওয়া গেছে। তারা জানতেন, এ কাজটা আমি ভালোই পারি। আলী যাকেরও অনুরোধ জানালেন। তখন রামেন্দুদা (রামেন্দু মজুমদার) থিয়েটার পত্রিকা বের করতে শুরু করেছেন। আমি সেই পত্রিকার সহ-সম্পাদক। হুট করে নাগরিকে আমি যোগ দিই কীভাবে? রামেন্দুদার কাছে অনুমতি চাইলাম। রামেন্দুদা খুব একটা রাজি হচ্ছিলেন না। ফেরদৌসী আপা (ফেরদৌসী মজুমদার) অনুমতি আদায় করে দিলেন। আমি নাগরিকে যোগ দিলাম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আলী যাকের হয়ে গেলেন 'ছোটলু ভাই'। তিনি আপনি থেকে 'তুই' সম্বোধনে নামলেন। আমি 'তুমিতে'।

প্রায় প্রতিদিনই মহড়া। আলী যাকেরের বাসা রাজারবাগে 'ছায়ানীড়' নামক একটি বাড়ির দোতলায়। ড্রয়িংরুমে মহড়া। চা-মুড়ি সহযোগে মহড়া চলছে। আমরা অনেকে রাতেও থেকে যাচ্ছি। রাতে দু'ডজন ডিম ভাজা, ডাল আর ভাত। থেকে যাওয়া মানে ধুন্ধুমার আড্ডা। আড্ডার মধ্যমণি ছোটলু ভাই। সেসব নিছক আড্ডা ছিল না। বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে কথা হতো- নাটক থেকে শুরু করে রাজনীতি, কবিতা থেকে শুরু করে বিশ্বসাহিত্য, সংগীত থেকে শুরু করে প্রাণায়াম। কী হতো না সেখানে! আসতেন আমাদের সবার গুরু ওয়াহিদুল হক, সংগীতে সর্বদা নিমগ্ন মাহমুদুর রহমান বেনু। তাদের সঙ্গে যে সময়টা কাটত সে সময়টা ছিল দুর্লভ অভিজ্ঞতা। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও ছোটলু ভাইয়ের সমান দক্ষতা। শেকসপিয়র, বায়রন, শেলি, কিটস পড়ে শোনাতেন অপূর্ব দক্ষতায়। ব্যাখ্যা করতেন অন্তর্নিহিত নির্যাস। সে স্বাদ গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়েছি আমি। একবার ছোটলু ভাই ধরে নিয়ে এলেন নাটকের কিংবদন্তি পুরুষ উৎপল দত্তকে। পাঠ করলেন শেকসপিয়র; কণ্ঠস্থ। আমরা বিস্ময়ে অভিভূত। ছোটলু ভাইয়ের মাঝারি সাইজের ফ্ল্যাটটি ছিল আমাদের নাটকের পাঠশালা। 'বাকি ইতিহাস' ছোটলু ভাইয়ের প্রথম পরিচালনা। নিজে অভিনয় করেননি। নির্দেশক ছিলেন। ১৯৭৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি প্রথম প্রদর্শনী ব্রিটিশ কাউন্সিল মঞ্চে; বেলা ১১টায়। সাদামাটা সেট। ন্যূনতম কারিগরি ব্যবস্থায় অসাধারণ আলো-অন্ধকারের খেলা। অভিনয়ও ছিল দুর্দান্ত। ছোটলু ভাই আবেগাপ্লুত। সেদিন, যতদূর মনে পড়ে হলভর্তি দর্শক ছিল না। কিন্তু পরদিন থেকে উপচেপড়া দর্শক। শুরু হলো বাংলাদেশে মঞ্চনাটকের জয়যাত্রা এবং সে জয়যাত্রার নায়ক আলী যাকের।

এর পর থেকে নাগরিক একের পর এক নাটক মঞ্চায়ন শুরু করল। প্রায় সবই বিদেশি নাটকের রূপান্তর কিংবা অনুবাদ। এসবের মধ্যে অধিকাংশই আলী যাকেরকৃত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমিও তার সঙ্গী হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। যেমন 'সৎ মানুষের খোঁজে'। বের্টল্ড ব্রেখটের 'গুড পারসন অব সেটজুয়ান'' অবলম্বনে 'সৎ মানুষের খোঁজে।' বইটি হাতে পেয়ে ছোটলু ভাই আমাকে বললেন, 'তুই পুরোটা আগে অনুবাদ করে ফেল। আমি পরে রূপান্তর করব।' প্রসঙ্গত, আমি তখন একটি দূতাবাসে অনুবাদ ও গণসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করি। অনুবাদ করে ফেললাম। এর পর শুরু হলো রূপান্তরের কাজ। সেখানেও আমি তার সহযোগী হিসেবে কাজ করেছি। ছোটলু ভাই আমার রূপান্তর করা 'দেওয়ান গাজীর কিস্‌সা' গ্রন্থের ভূমিকায় উপরোক্ত নাটক সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন, 'ব্রেখটের এ নাটকটি প্রথমে অনূদিত হয় বাংলায়। অনুবাদ করেন আসাদুজ্জামান নূর। সেই অনূদিত নাটকের ওপর ভিত্তি করে আমি নাটকটি রূপান্তর করি। সেই রূপান্তরেও আসাদুজ্জামান নূরের যে অবদান, যে পরিশ্রম, সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।' এই কথাগুলো আমার সারাজীবনের অমূল্য সঞ্চয়। বস্তুত ছোটলু ভাই আমাকে একটা নতুন পথ দেখালেন- অনুবাদের পথ, রূপান্তরের পথ।

এর পরও তার সঙ্গে ছিলাম মলিয়েরের ইন্টেলেকচুয়াল লেডি অবলম্বনে 'বিদগ্ধ রমণীকুল' রূপান্তরের কাজে। আর এই নাটকটি মঞ্চস্থ হতো আরেকটি নাটকের সঙ্গে- সদ্য প্রয়াত রশীদ হায়দারের 'তৈল সংকট'। একটি ইন্টারভেলের আগে, আরেকটি পরে। এই 'তৈল সংকট' দিয়েই আমার নিয়মিত মঞ্চাভিনয়ের যাত্রা শুরু। কাহিনিটি লম্বা; বলেছি অনেকবার। তবুও সংক্ষেপে বলি। মহড়া চলাকালীন প্রয়াত চলচ্চিত্র নির্মাতা ও অভিনয়শিল্পী বাদল রহমানের ঘুষি লেগে (অসাবধানতাবশত) আবুল হায়াতের নাক গেল ফেটে। তিনি এ নাটকের মূল চরিত্রে অভিনয় করছেন। রক্তারক্তি অবস্থা। হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো। ডাক্তার বললেন, আগামী এক সপ্তাহ বিশ্রামে থাকতে হবে। কী করা! আলী যাকের দু'টি নাটকেরই নির্দেশক। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন, নূর যেহেতু প্রতিদিন রিহার্সালে প্রম্পট করে, মোটামুটি সব সংলাপই ওর মাথায় আছে। ওকেই এ চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। আমার মাথায় বাজ। অভিনয়! স্কুল-কলেজ আর সংস্কৃতি সংসদের নাটকে কখনও-সখনও ছোটখাটো দু-একটা চরিত্রে অভিনয় করেছি বটে। সেগুলোকে ঠিক অভিনয় বলা চলে না। কিন্তু নির্দেশকের হুকুম- মানতেই হবে। দু'দিন পরে শো। প্রধান নারী চরিত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা, মানবাধিকার নেত্রী সুলতানা কামাল। দিনরাত মহড়া দিয়ে মঞ্চে নামলাম। বলতে গেলে ছোটলু ভাই প্রায় আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে উইংসের পাশ থেকে মঞ্চে ঢুকিয়ে দিলেন। এবারও তিনি আরেক নতুন পথে নিয়ে গেলেন- অভিনয়। এভাবেই শুরু হলো আমার নিয়মিত মঞ্চাভিনয়ের পালা।

নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় তখন একের পর এক নাটক করে চলেছে। কিন্তু নাটক লেখার মানুষ তো খুব কম। শ্রদ্ধাভাজন আবদুল্লাহ আল-মামুন লিখছেন তার দল 'থিয়েটার'-এর জন্য। মমতাজ স্যার লিখছেন থিয়েটারের জন্য। তিনি ওই দলের সদস্য। মামুনুর রশীদ লিখছেন তার নিজের দল 'আরণ্যক'-এর জন্য। সেলিম আল দীন তখন বিপুল আলোচনায় তার নবধারা সৃজনের জন্য। তিনিও লিখছেন তার দল 'ঢাকা থিয়েটার'-এর জন্য। সৈয়দ শামসুল হক লিখলেন 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'। দিলেন 'থিয়েটার'কে। আমরা নাটক পাই কোথায়? অতএব বিদেশি নাটকের অনুবাদ অথবা রূপান্তর। আমাদের দল নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের নাম হলো 'সাহেব দল'। আমরা বিদেশি নাটক করি। এদিকে আলী যাকের একের পর এক বিদেশি নাটকের রূপান্তর করে চলেছেন। এক পর্যায়ে আমাকে বললেন, 'এবার তুই কর। তুই পারবি। তুই যে কটা নাটকে আমার সঙ্গে কাজ করেছিস, তাতে আমার স্থির বিশ্বাস- তুই পারবি।' এ আরেক বিপদ। অন্যেরাও সমর্থন করলেন। আলী যাকের আমার হাতে তুলে দিলেন 'পুন্টিলা অ্যান্ড হিজ ম্যান মাট্টি'। রূপান্তরিত হলো 'দেওয়ান গাজীর কিস্‌সা' নামে। শুরু থেকেই আমি ভাবছিলাম, এমন একটি আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করব, যা সবাই বুঝবে এবং বাংলাদেশে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, নির্যাতন উঠে আসবে এবং প্রতিবাদও। ব্রেখটের অনেক নাটকে নাচ-গান থাকে। আমি তার প্রভূত ব্যবহার করেছিলাম। যাক সে প্রসঙ্গ। প্রথম দৃশ্যটা লেখা হলে আমি যখন ছোটলু ভাইকে শোনালাম; ছোটলু ভাই লাফিয়ে উঠে বললেন, ব্যস, জমে গেছে। এর পর 'দেওয়ান গাজী' ইতিহাস। ইতিহাস গড়লেন আলী যাকের; তার দুর্দান্ত অভিনয় দিয়ে। এ চরিত্র করার সাহস আজ পর্যন্ত কেউ করল না। কেউ সাহস করেনি নূরলদীন বা গ্যালিলিও চরিত্রে অভিনয় করতে। আমি আবারও তার হাত ধরে এবার প্রবেশ করলাম অসীম সাহসে স্বাধীনভাবে রূপান্তরের কাজে। এর আগে ছিলাম তার সহযোগী। এবার তিনি সাহস জোগালেন- এগিয়ে যা।

তার নির্দেশনায় 'নূরলদীনের সারাজীবন'-এ 'আব্বাস', 'কোপেনিকের ক্যাপ্টেন' নাটকে 'ক্যাপ্টেন', 'খাট্টা তামাশায় ভূতিবাবু' চরিত্রে অভিনয় করেছি, যা আমার অভিনয় জীবনের বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা; অভিনেতা হিসেবে অনেক বড় প্রাপ্তি। কতভাবে শিখেছি নিজেকে সংহত করতে, সংযত করতে, প্রকাশ করতে, প্রক্ষেপণ করতে মাঝেমধ্যে মনে হতো, তিনি আমাদের কী শেখাচ্ছেন- শিল্প, না বিজ্ঞান? ধারালো পর্যবেক্ষণ, নিখুঁত দিকনির্দেশনা, শরীরের ভঙ্গিমা, মুখমণ্ডলের প্রকাশভঙ্গি নির্মাণ- সবকিছু তার কাছেই শেখা। শুধু নাটক না; আমার জীবনও গড়ে দিয়েছেন তিনি। স্বাধীনতার পর নানা সংকটে পড়ে গেলাম। মূলত অর্থ সংকট। ছোট চাকরি করি। চলতে পারি না। বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে মাস শেষে টাকা ধার করি; বেতন পেলে পরিশোধ করি। আবার মাস শেষে হাত পাতি। একটা সাইকেলে চলাফেরা করি। বাস ভাড়া লাগে না। এর পর একটি বিদেশি দূতাবাসে চাকরি পেলাম। ধানমন্ডিতে অফিস। জিগাতলায় মনেশ্বর রোডে একটি অতিসাধারণ বাসা ভাড়া নিলাম। পাশেই হাজারীবাগ ট্যানারি। চামড়ার দুর্গন্ধে বাড়িতে অতিথি আসে না। একদিক দিয়ে ভালোই। অতিথি আপ্যায়নের খরচ লাগে না। বেলা ২টা পর্যন্ত অফিস করে সাইকেল চালিয়ে মতিঝিলে যাই এশিয়াটিকে বিজ্ঞাপনের কপি লিখতে। প্রতিদিন তো আর কপি লেখা থাকে না। কোনো কোনোদিন থাকে। কপি অনুমোদিত হলে কিছু পয়সা পাই। একদিন ছোটলু ভাই ডেকে বললেন, তুই এশিয়াটিকে যোগ দে। এত টাকা পাবি। আমি বললাম, 'ছোটলু ভাই', আমি এখন যে বেতন পাই এ তো তার চেয়ে কম; চলব কী করে তিনি উত্তরে বললেন, 'আপাতত একটু কষ্ট কর। দূতাবাসে চাকরির কোনো ভবিষ্যৎ নেই। ওখানে হয়তো কিছু বেতন বাড়বে। কিন্তু এক সময় তো থেমে যাবে। বিদেশি দূতাবাসে তোর ভবিষ্যৎ কী? এখানে আয়, একসঙ্গে কাজ করি।'

চাকরিটা ছেড়ে এশিয়াটিকে যোগ দিলাম। আজ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি- আমি ভুল করিনি। ছোটলু ভাই আমাকে সঠিক পথেই নিয়ে গিয়েছিলেন। বলতে গেলে একটু জোর করেই। ওই জোরটুকু না করলে আমার জীবন কেমন হতো, জানি না! আমার নাটকের জীবন, পেশাগত জীবন আমাকে অনেক ভালোবেসে নিজ হাতে গড়ে দিয়েছেন। তাই কেউ জিজ্ঞেস করলে বলি, ছোটলু ভাই আমার পিতৃতুল্য বন্ধু।

৩ ডিসেম্বর ২০২০ দৈনিক সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত

আলোর পথযাত্রী...

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি

এক সাথে পথ চলা

সহযাত্রীদের সাথে আনন্দঘন মুহূর্ত

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সঙ্গীত শিল্পী কবীর সুমন-এর আগমন উপলক্ষে আয়োজন

নবীণ-নবীনাদের মুক্তিযুদ্ধের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধকরণের শপথ গ্রহণ

প্রথম আন্তর্জাতিক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব-এর উদ্বোধনী আয়োজনে

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মত বিনিময়

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কার্যক্রম নিয়ে বিদেশি প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায়

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যে কোন আয়োজনে সবার সাথে সবার মাঝে

শ্রদ্ধেয় আলী যাকেরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

কে বি আল আজাদ

ছোটলু ভাই, অনন্তের পথে যাত্রা করেছেন গত নভেম্বর মাসের ২৭ তারিখে। সেই কবে ১৯৭৩ সনের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর হাত ধরে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ে প্রবেশ এবং পরবর্তীকালে শব্দ এবং সংগীত পরিকল্পকের দায়িত্ব পাওয়া। সেই থেকে একটা দীর্ঘ সময় তাঁর সাহচর্যে নানা বিষয়ে বিভিন্নভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছি। আসলে এত কিছু লেখার আছে যার বেশির ভাগ নাটকের বাইরে, ভীষণ ব্যক্তিগত অজস্র মুহূর্ত। মনে পড়ে ১৯৭৩ সনের মধ্যবর্ত্তী সময় থেকে প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যায় ছোটলু ভাইয়ের বাসায় আড্ডা হতো, যেখানে শিল্প সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা প্রাধান্য পেতো। তবে বেশিরভাগ সময় কবিতা পাঠ করা এবং ছোটলু ভাইয়ের অনেক প্রিয় কবিতার মধ্যে দুটির কথা খুবই মনে পড়ছে। ভীষণ আবেগ দিয়ে পাঠ করতেন জীবনানন্দ দাশের 'ক্যাম্পে' কবিতাটি। স্মৃতি থেকে কবিতার দুটি লাইন মনে পড়ছে 'আকাশের চাঁদের আলোয়, এক ঘাই হরিণীর ডাক শুনি'। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর 'কলকাতার যিশু' কবিতাটিও খুব পছন্দ করতেন। 'ভিখিরি মায়ের শিশু, কলকাতার যিশু, সমস্ত ট্রাফিক তুমি থামিয়ে দিয়েছো কোন মন্ত্রবলে', মনে হতো বুকের ভেতরে বুঝি একটা আর্তনাদ হলো। পূর্ণেন্দু পত্রীর একটি কবিতা 'বড়ে গোলাম' তাঁর পছন্দের ছিল। উৎপল দত্তের 'চায়ের ধোঁয়া' থেকেও একটি বা দুটি প্রবন্ধ পাঠ করতেন মনে পড়ে। কবিতা অথবা প্রবন্ধ সবই পাঠ করতেন প্রচণ্ড আবেগঘন কণ্ঠে। ছোটলু ভাই নির্দেশিত রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকের শব্দ ও সঙ্গীত পরিচালনার কথা মনে পড়ে। নাটক শুরু হওয়ার আগে তিনি চেয়েছিলেন পনের মিনিট রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজবে এবং সে অনুযায়ী কিছু গান নির্ধারণ করেছিলেন। যখন নাটক মঞ্চস্থ হলো তখন দেখলাম ছোটলু ভাইয়ের সিদ্ধান্তটি নাটকের আবহকে এক নতুন মাত্রা প্রদান করেছে। মনে পড়ে তাঁর নির্দেশিত 'খাট্টা তামাশা' নাটকের কথা। পটভূমি তেতাল্লিশ-

এর মনন্তরের সময়কার। ঠিক করলাম হারমোনিয়াম এবং সানাই ব্যবহার করবো। সেই কবে বাংলাদেশ টেলিভশনে একজনকে দেখেছিলাম হারমোনিয়াম উল্লো করে ধরে রিড না দেখে বাজাতে। দুই সপ্তাহের অক্লান্ত চেষ্টার পর তাকে খুঁজে বের করলাম।

আর কয়েকটি কথা বলতে হবে। শ্রদ্ধেয় সৈয়দ শামসুল হকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর সঙ্গে যিনি একাধারে উদ্ভিদ জিনতত্ত্ব বিশারদ, প্রথিতযশা আলোক চিত্রী এবং রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' নিয়ে তাঁর তোলা ছবি দিয়ে সাজানো চমৎকার একটি বই এবং Wild Flowers of Bangladesh নামে অসাধারণ আরেকটি বই যেখানে ছোটলু ভাইয়ের তোলা অনেকগুলো ছবি স্থান পেয়েছে। পরবর্তীতে তাঁর সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আবারও সশ্রদ্ধ চিত্তে ছোটলু ভাইয়ের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সেই কবে মনে করতে পারছিনা শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষ এবং কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ছোটলু ভাইয়ের বাসায়। অনেক বছর পরে, ৯৬ বা ৯৭ সন, মনে নেই, ভুল হতে পারে। ছোটলু ভাই বললেন, তোদের (এমি এবং আমি)

রতনপুর নিয়ে যাব। পৌঁছে দেখি তিনি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে, পাড়ে রাখা একটি ইঞ্জিন চালিত নৌকায় উঠলাম। শিবপুরে আচার্য আলাউদ্দিন খাঁন সাহেবের জন্মস্থানে যাচ্ছি আমরা, বললেন তিনি। মৃদু শিহরিত হলাম, আনন্দে মন ভরে গেল। ফিরে এলাম রতনপুরে। পরদিন সকালে তাঁর পৈত্রিক বাড়িতে অনেক কিছু দেখালেন, বিশেষ করে পুকুর পাড়ে যেখানে তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় বাবা ইংরেজি কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। আসলে ১৯৭৩ থেকে এতোটা দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি তাঁর সঙ্গে যা স্মৃতির অতল থেকে তুলে আনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং অপার স্নেহ তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি তা আমার এবং আমাদের জীবনে আমৃত্যু স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আলী যাকের : আছে নাম যশ খ্যাতি, আছে অন্য এক পরিচয়

মুক্তিযোদ্ধা আলী যাকের-এর রয়েছে খানদানি পারিবারিক পরিচয় ও বর্ণাঢ্য, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পেশাগত সমৃদ্ধ অতীত। এসকল বিষয়ে কথা বলার যোগ্যতা আমার নেই। তবে দীর্ঘ পচিশ বছর ধরে, যে বিষয়কে অবলম্বন করে তাঁকে জেনেছি এক ভিন্ন উপলব্ধি ও শ্রদ্ধা নিয়ে। একজন আপোষহীন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা এবং অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ সৎজন। এই দুটো বিষয়ে আমার বলার আছে।

ধারাবাহিক ছায়া পাত

প্রেরণায় তিনি

স্মৃতির মনিকোঠায় এখনও জ্বলজ্বলে ২০০৫ সালে আমি যখন জাদুঘর প্রদর্শনী ও সংগ্রহ ব্যাবস্থাপনার উপর ইন্টার্নশিপ করতে আমেরিকা যাই, যাত্রার পূর্বে যাকের ভাইয়ের সাথে দেখা, তিনি বললেন, 'আমেনা তুমি এয়ার স্পেইস মিউজিয়াম টা অবশ্যই দেখবে। তাতে তুমি বড় অবজেক্ট কি করে শূন্যের উপর হ্যাং করে এক্সিবিট করে তার কৌশল বুঝতে পারবে'। কত বড় করে ভাবতেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এত বড় অবজেক্ট নেই, কিন্তু তিনি আমাকে বড় অবজেক্ট প্রদর্শন শিখতে বললেন। চোখে অফুরান স্বপ্ন নিয়ে চলা এক তরুণীকে যখন আলী যাকেরের মতো দ্বিগজ এরকম প্রশ্রয় দেয়, তখন তাকে আকাশে উড়তে ঠেকায় কে !

ফিরে এসে ট্রাস্টি বোর্ডের সাথে একটি ফলোআপ মিটিং যেখানে আমি কি শিখেছি এবং কিভাবে তা ভবিষ্যতে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই সে বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করি। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই আলোচনায় আলী যাকের ভাই সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং এপ্রিশিয়েট করেছেন। অনেক হাস্যরসের মাধ্যমে কাজের কথাও হয়েছে। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমেনা প্রথম আমেরিকা **ভ্রমণের অ**-ভজ্ঞতায় তোমার কোন জিনিসটা অবাক করেছে? বললাম, ইমিগ্রেশনে জুতো খুলতে হয়। হেসে দিয়ে বললেন, আগে এরকম ছিলো না। যখন প্রথম আমার জুতা খুলতে হলো, আমি মেয়েটিকে বললাম, `Such a nice experience a beautiful lady is carrying my shoes!'সুদুর আমেরিকা থেকে প্রায় ২০ কেজির মতো ফাইলপত্র বয়ে এনেছি দেখে বললেন, 'এতকিছু তুমি বয়ে নিয়ে এসেছো? শপিং করনি?' বললাম হা, এগুলো কাজের তাই, আর একটু শপিং ও করেছি। তিনি বললেন, 'তোমার এই ডেডিকেশনের জন্য ভবিষ্যতে ভালো ভালো কাজ করবে। অনেক প্রত্যাশা তোমার কাছে। যা শিখলে তোমার কাজে তার প্রয়োগ দেখার অপেক্ষায় রইলাম আমেনা।' একটি মেয়ের তাঁর প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর এধরণের উক্তি বেশ উৎসাহব্যাঞ্জক ও আশাদায়ক।

তরুণদের পেশাদারিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা

জাদুঘরের আর্কাইভ থেকে যখনই তাঁর কোনো কিছু প্রয়োজন হতো এমনভাবে বলতেন, 'আমেনা তুমি কি একটু দেখবে অমুক জিনিসটা আছে কিনা? খুঁজতে সময় লাগবে। তাড়াহুড়োর দরকার নেই, তোমার সুবিধামত সময়ে জানিও। আমি লোক পাঠাবো।' জাদুঘরের ট্রাস্টি হয়েও অন্য গবেষকের মতোই নিয়ম মেনে, নির্ধারিত ব্যয় পরিশোধ করে তিনি কপি নিতেন। কারো সাথে পরিচয় করানোর সময় পুরো নাম এবং কোন ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বে আছি সম্মানের সাথে বলতেন যা একজন তরুণ শিক্ষানবিশের জন্য **অসীম প্রেরণার যা আজীবন পথচলায় নির্ভরতার রেখ**-াপাত করে।

অস্তিত্বে অমলিন

শুরুটা দিয়েই ধরে রাখতে চাই। আলী যাকের ভাই জাদুঘরে আপনি যেভাবে প্রবেশ করতেন, কিছুটা এরকম- আপনার আগমন, উপস্থিতি ও প্রাণখোলা হাসিতে স্বরব হয়ে উঠতো যে কোনো মহল। অনেকখানি যায়গা জুড়ে যখন হাঁটতেন, অংগভঙ্গীতে, সামনের মানুষটির সাথে আপনার ইন্টার‍্যাকশন যেন মানুষটিকে আপনি চিনেন, আর সেই ভাবনাকে আরো দৃঢ় করে তুলতেন আপনার পরিচিত সেই প্রশ্রয় মাখা হাসিতে। যা মানুষকে আপনার কাছে আসার হাতছানি দিত। আপনি সময় দিতেন যে কাউকে, কথা বলতেন। অত্যন্ত মানবিক শক্তিশালী এই গুণের কথা কখনো বলা হয়নি। বলা হয়নি আপনি কতটা স্নেহ প্রবণ, যে একবার এর ছোঁয়া পেয়েছে তাঁর কাছে আপনি মৃত্যুঞ্জয়ি ধ্রুব তারা। এজন্যই আপনি খুব আপন, পছন্দের, ভালোবাসার মানুষ। এভাবেই বেঁচে থাকবেন ভাইয়া।

ভালোবাসার অর্ঘ্য নিবেদনে তাই অন্তর থেকে বলি-

আলী যাকের

এ প্রস্থান যেন প্রস্থান নয়, নব নবরূপে ফিরে আসা

ভালোবাসা শুধু ভালোবাসায় বেঁচে থাকা

আছে নাম যশ খ্যাতি, আছে অন্য এক পরিচয়

প্রশয়মাখা হাসিতে কেমন আপন করিয়া লয়

ভালোবাসার অভিবাদন।

ইতি, **আমেনা খাতুন**

সহকর্মীদের স্মৃতিতে আলী যাকের

একাত্তরের শব্দসৈনিক, বরেণ্য নাট্যজন, অগ্রজ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি আলী যাকেরের প্রয়াণে তাঁর সুহৃদ, সহকর্মী, সহযোদ্ধাদের শোকানুভূতি (বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত)

মহামান্য রাষ্ট্রপতি এক শোকবার্তায় বলেন, ' বরেণ্য অভিনেতা আলী যাকের ছিলেন দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একই সঙ্গে এক বরেণ্য অভিনেতা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে হারাল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মহান মুক্তিযুদ্ধ, দেশের শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে স্মরনীয় হয়ে থাকবে আলী যাকেরের অবদান। (সূত্র : দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ নভেম্বর ২০২০, শনিবার)

ঈর্ষণীয় সফল মানুষ

নাসির উদ্দিন ইউসুফ

আমাদের কালের ঈর্ষণী
যাকের। বাংলাদেশের
অপরিসীম, তেমনি ক
স্বাধীন বাংলাদেশের যে
ভূমিকা অনস্বীকার্য। তি

ঈর্ষণীয় সফল মানুষ, নাসির উদ্দীন ইউসুফ, 'আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধকালে এক দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হন এবং সে সংগ্রাম এখন পর্যন্ত জারি আছে এবং আলী যাকের জীবনের শেষদিন এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সেই আদর্শে অবিচল ছিলেন। এটি খুব কঠিন কাজ। দীর্ঘ সময় ধরে নিজ আদর্শে বিশ্বাসের প্রতি অবিচল থাকা, এটি কিন্তু সহজ কাজ নয়। এই কাজটি আলী যাকের করে দেখিয়েছেন। এটি একটি আদর্শ সৃষ্টিকারী কাজ বরে আমি মনে করি।'

(সূত্র : দৈনিক যুগান্তর, ২৮ নভেম্বর ২০২০, শনিবার)

নিভে গেল এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

বনানীতে চিরনিদ্রায়

● নিজস্ব প্রতিবেদক

নিভে গেল বাংলা নাট্যাঙ্গনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ক্যান্সারের সঙ্গে ৪ বছরের লড়াই শেষে গতকাল শুক্রবার ভোরে চির বিদায় নিলেন একাত্তরের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক, কিংবদন্তি অভিনেতা, নির্দেশক আলী যাকের। তার বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। মৃত্যুর আগে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছিল তার। রাজধানীর বনানী কবরস্থানে চিরনিদ্রায় তাকে শায়িত করা হয়। এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

'তার সঙ্গে আমার পাঁচ দশকের বন্ধুত্ব, একসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আবার সেই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শগুলোকে বাস্তবায়ন, সবই একসঙ্গে করেছি। মঞ্চে যেরকম দুর্দান্ত সাহসী অভিনেতা ছিলেন, বাস্তবতায়ও মানুষ হিসেবে ছিলেন তেমন সাহসী। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তার অভিনিত চরিত্রগুলোতো মাইলস্টোন এককেটা। আমাদের গ্যালিলিওর মতো আরেকটি সৃষ্টি খুব কঠিন। ... তিনি নির্দেশক হিসেবেও ছিলেন অত্যন্ত কৌশলী। এরকম সফল একজন মানুষের করোনায় চলে যাওয়াটা খুবই দুঃখের।'

(সূত্র : দৈনিক সমকাল, ২৮ নভেম্বর ২০২০, শনিবার)

যাঁরা বিগত হন না, তাঁদেরই একজন তিনি : মামুনুর রশীদ, 'আজকে বাংলাদেশের যে নাট্যচর্চা, যেটা অনেকেই বলেন, স্বাধীনতার সোনালী ফসল হচ্ছে নাটক।... আমরা যখন কাজ শুরু করেছিলাম, আলী যাকের যখন মঞ্চে কাজ শুরু করেছিল, তখন এদেশে মঞ্চ ছিল না। মহিলা সমিতি, গাইড হাউস, ব্রিটিশ কাউন্সিল-এসব জায়গা খুঁজে খুঁজে আমরা অভিনয় করেছি, সে এক কঠিন কাজ বটে। সেই কঠিন কাজটির জন্য যে উদ্যম এবং যে সাহস প্রয়োজন ছিল, সেটা আলী যাকেরের মধ্যে ছিল শতভাগ। কখনো কখনো তারচেয়েও বেশি।... আজকে যে নাটক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও পেয়েছে, সেই ক্ষেত্রে আলী যাকেরের যে ভূমিকা, শুধু বাংলাদেশের নাটক বলব না, বাংলা নাটকে তাঁর যে অবদান-ভূমিকা, সেটা অবিস্মরণীয়। তাই দর্শকের স্মৃতিতে আলী যাকের বেঁচে থাকবেন অনেকদিন। আর নাট্যকর্মীদের কাছে একটি প্রেরণা হয়ে বেঁচে থাকবেন যতদিন বাংলাদেশে থিয়েটার থাকবে ততদিন। যাঁরা গত হন, বিগত হন না, তাঁদেরই একজন আলী যাকের।

যুগান্তর | শনিবার ২৮ নভেম্বর ২০২০ | ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৭

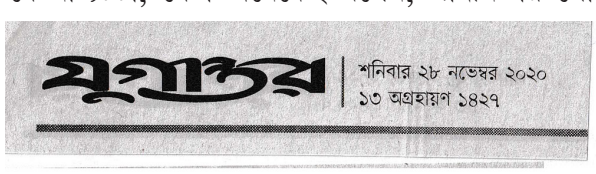

জীবনমঞ্চ ছেড়ে গেলেন আলী যাকের

সাংস্কৃতিক রিপোর্টার

বরেণ্য অভিনেতা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আলী যাকের আর নেই। শুক্রবার ভোর ৬টা ৪০ মিনিটে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং জানাজা শেষে তার মরদেহ বনানী কবরস্থানে দাফন করা

■ পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৬

● সহকর্মীদের স্মৃতিতে আলী যাকের : পৃষ্ঠা ১৫

(সূত্র : দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৮ নভেম্বর ২০২০, শনিবার)

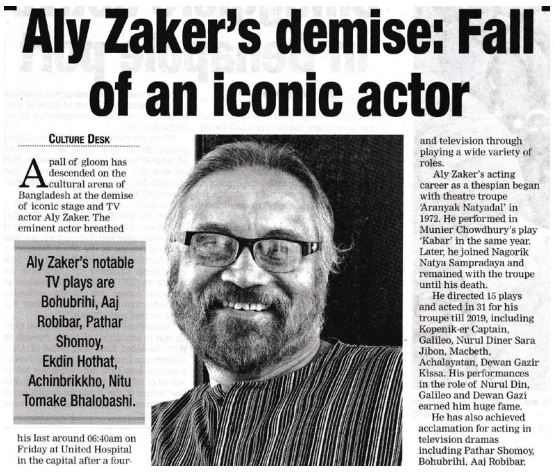

Aly Zaker's demise: Fall of an iconic actor

CULTURE DESK

A pall of gloom has descended on the cultural arena of Bangladesh at the demise of iconic stage and TV actor Aly Zaker. The eminent actor breathed his last around 06:40am on Friday at United Hospital in the capital after a four-

Aly Zaker's notable TV plays are Bohubrihi, Aaj Robibar, Pathar Shomoy, Ekdin Hothat, Achinbrikkho, Nitu Tomake Bhalobashi.

and television through playing a wide variety of roles.

Aly Zaker's acting career as a thespian began with theatre troupe 'Aranyak Natyadal' in 1972. He performed in Munier Chowdhury's play 'Kabar' in the same year. Later, he joined Nagorik Natya Sampradaya and remained with the troupe until his death.

He directed 15 plays and acted in 31 for his troupe till 2019, including Kopenik-er Captain, Galileo, Nurul Diner Sara Jibon, Macbeth, Achalayatan, Dewan Gazir Kissa. His performances in the role of Nurul Din, Galileo and Dewan Gazi earned him huge fame.

He has also achieved acclamation for acting in television dramas including Pathar Shomoy, Bohubrihi, Aaj Robibar,

বিদায় বস : রামেন্দু মজুমদার, 'কবে কখন থেকে আমরা পরস্পরকে বস বলে সম্বোধন করতাম আজ আর তা মনে পড়ে না, যদিও প্রায় একই সময়ে আমরা করাচিতে কাজ করতাম, একই পেশায়, ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, তখন কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ও আলী যাকেরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। এমনকি দেখা হয় নি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রেও। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে সূচনা হলো এক বন্ধুত্বের, দিনে দিনে তা গভীরতর হয়েছে। তাঁর জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই কি ছিন্ন হবে সে বন্ধন? না, আমাদের সম্পর্কের সুখস্মৃতি বয়ে বেড়াব যতদিন আমি বেঁচে থাকব। আলী যাকের এক পরিপূর্ণ জীবন, যেখানে হাত দিয়েছেন, সোনা ফলেছে। পেশাগত জীবনে তাঁর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানকে পৌছে দিয়েছেন শীর্ষে। ... যাকেরের জীবনের একটা গৌরবের অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতি অনুগত ছিলেন আমৃত্যু। এক্ষেত্রে কোন আপোষ করেননি কোন দিন। যখনই সুযোগ পেয়েছেন, আমাদের সঙ্গে প্রতিবাদী সভা সমাবেশ মিছিলে যোগ দিয়েছেন। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তাকে পেয়েছি সামনের সারিতে। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে একাত্তরের ঘাতকদের বিচারের দাবিতে অনুষ্ঠিত গণ আদালতে অংশ নেয়ার জন্য যে ২৪ জন বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যাকের ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ... জানি, জীবন থেমে থাকে না। তাইতো রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়নিয়ে গাইতে চাই 'আছে দুঃখ; আছে মৃত্যু/ বিরহদহন লাগে/ তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।'

সহকর্মীদের স্মৃতিতে আলী যাকের

বিষণ্ণতার একটি দিন ছিল গতকাল। কুয়াশার চাপে ভোরের সূর্য তখনও হয়তো দিনের সন্ধান দিতে পারেনি। কিন্তু দুঃসংবাদ ঠিকই সেই কুয়াশা ভেদ করে চলে এলো। ঝরে পড়ল আরও একটি নক্ষত্র। মারা গেলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত অভিনেতা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব আলী যাকের। গতকাল শুক্রবার ভোর ৬টা ৪০ মিনিটে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তার মৃত্যুতে শোকাহত সংস্কৃতি অঙ্গন। সহকর্মীদের অনেকেই জানিয়েছেন তার সঙ্গে কাটানো সময়ের কথা। তার কিছু অংশ তুলে ধরা হল

(সূত্র : দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৮ নভেম্বর ২০২০, শনিবার)

মঞ্চ নাটকের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল: ফেরদৌসী মজুমদার, 'দুই মাস আগে তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। খুব খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, আরো কিছু কাজ করে যেতে পারলে ভালো হতো। তাঁর সঙ্গে কাটানো স্মৃতির কথা মনে উঠলে প্রথমে আসে 'ম্যাকবেথ'-এর কথা। আমরা দুজন দুই দলের হলেও এই নাটকে একসঙ্গে কাজ করেছিলাম। তিনি খুব ব্যস্ত জীবন কাটিয়েছেন। নিজের বিজ্ঞাপনী সংস্থা সামলে আবার নিয়মিত মঞ্চে কাজ করতেন। গোছানো মানুষ না হলে এটা অসম্ভব। (সূত্র : দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৮ নভেম্বর ২০২০, শনিবার)

Aly Zaker with long time collaborator, actor Tariq Anam Khan FACEBOOK

'I've lost a friend and a brother'

Showtime Report

Actor Tariq Anam Khan was a close friend and collaborator of legendary thespian Aly Zaker. He recalled his memories of the late actor in this chat with Dhaka Tribune Showtime.

"There was a childlike playfulness about him. There was a street in Tangail notorious for being a hotspot for robbery. He once took me to that street to see robbers, which was madness, I thought. We even protested on the streets together during the dem-

আবুল হায়াত, 'প্রতি নিয়ত ভয়ে থাকি, কখন কোথা থেকে দুঃসংবাদ আসে। আলী যাকের চলে গেল আমাদের ছেড়ে। ৫০ বছর আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। কত স্মৃতি তার সঙ্গে, সব শেষ হয়ে গেল। গত মার্চে তার বাসায় গিয়ে আড্ডা দিয়েছি। বলেছিলাম, তুই আবার সুস্থ হবি; আমরা একসঙ্গে মঞ্চে কাজ করব। কিন্তু তা আর হলো না। বন্ধুকে বিদায় দিতে সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছে। পরপারে ভালো থাকুক যাকের।

(সূত্র : দৈনিক যুগান্তর, ২৮ নভেম্বর ২০২০, শনিবার)

পরবর্তী পৃষ্ঠায়

সহকর্মীদের স্মৃতিতে আলী যাকের

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর

একটি আলোকিত অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি : আতাউর রহমান, 'বিভিন্ন দেশে সিনেমা হলগুলোতে একটি নাটক-সিনেমা ছয় মাস বা বছর ধরে চলে, বহু শো হয়। আমাদের দেশে কনসেপ্ট ছিল- নাটকের দুই তিনটি শো হওয়ার পর তা বন্ধ হয়ে যেত। টিকিট বিক্রির মাধ্যমে একটি নাটকের ৫০টা শো কেন হবে না-এই চিন্তা আসে আলী যাকেরের মাথায়। ১৯৭৩ সালে এ বিষয়ে আলী যাকের একটি কনসেপ্ট নিয়ে আসেন। আমরা তাকে সমর্থন দেই। আলী যাকেরের অপূর্ব নির্দেশনায় ব্রিটিশ কাউন্সিলে বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' নাটক করি। ... নির্দেশনা ও অভিনয় দুই ক্ষেত্রেই সমান পারঙ্গম ছিলেন আলী যাকের। লেখাপড়ার প্রতি তার খুব ঝোঁক ছিল। সন্ধ্যা থেকে আমাদের আড্ডা শুরু হতো, কখনও আলী যাকেরের বাসায়, কখনও আমার বাসায়। আমাদের আড্ডায় শুধু অভিনেতারাই আসতেন না, বিখ্যাত পেইন্টার, কবি ও ঔপন্যাসিকরাও আসতেন। অনেক সময় সারারাত আড্ডা দিয়ে সকাল ১১টায় মহিলা সমিতিতে নাটক করেছি। ... আলী যাকের বাঙালি ছিলেন, বাংলাদেশি ছিলেন এবং বাঙালির শতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরম বিশ্বাসী একজন আলোকিত মানুষ ছিলেন। ... আমরা যারা তার সঙ্গে কাজ করেছি আমাদেও বয়স হয়েছে, অনেকেই চলেও গেছেন। তবে আলী যাকেরের চলে যাওয়ার প্রভাব থাকবে দীর্ঘ মেয়াদে। তিনি কীভাবে অভিনয় করতেন বা তার জীবনচারণ কেমন ছিল তা নিয়ে আলোচনা হবে, লেখালেখি হবে। আমার বয়স থাকলে হয়তো আমিও লিখতাম। আলী যাকেরের প্রস্থানে নিঃসন্দেহে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। তবে তিনি আমাদের থেকে চিরবিদায় নেননি। তিনি আমাদের মাঝে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবেন তার কর্ম, আদর্শ ও উঁচু মাপের ব্যক্তিত্বের কারনে।(সূত্র : দৈনিক সমকাল, ২৮ নভেম্বর ২০২০, শনিবার)

A LIFE DEVOTED TO BEAUTY AND THE ARTS; Demise of our greatest theatre personality : Mahfuz Anam, ` Most Talented People are not so good at `guru shishya parampara' but his warm, inclusive, engaging and modest personality broke the barriers and inspired generations of youngsters to take the theatre or at least become knowledgeable about this art form. He played a leadership role in triggering what later became a movement that created hundreds of theatre groups, thousands of actors and millions of theatre fans in the newly liberated country. In fact theatre movement became a beacon of hope for the establishment of the ideals of our independence struggle—a democratic prosperous and secular Bangladesh. (সূত্র : ডেইলি স্টার, ২৮ নভেম্বর ২০২০, শনিবার)

স্মৃতিতে ছোটলু ভাই

ছোটলু ভাইয়ের চলে যাওয়ার খবর শুনে কত কথাই মনে পড়েছে। সেই অভয়দাস লেনে হেনা চাচীর বাড়িতে একটা কালো গাড়ি করে রাজিয়া খালা আসতেন। মাঝে মাঝে সঙ্গে তাঁর ছেলেমেয়েরাও। নুটু আপা, বাবলু ভাই, ঝুনু আপা আর ছোটলু ভাই। আমরা যেদিন চাচীর বাড়ির মাঠে খেলতে যেতাম ছোটলু ভাই এলে আমরা একসাথে খেলায় মেতে উঠতাম। এর পরে খুব একটা দেখাশোনা হয়নি আর। ছোটলু ভাইয়ের গলা শুনতে পেলাম একেবারে একাত্তরে স্বাধীন বাংলা বেতর কেন্দ্র থেকে সংবাদ পাঠক হিসেবে। তারপর একসাথে নাগরিক-এর নাটক করা। ছোটলু ভাইদের রাজারবাগের বাড়িতে রিহার্সেলে নিত্য আনাগোনা। এর মাঝে আমি সিলেট চলে যাওয়াতে তেমন দেখা সাক্ষাৎ হত না কোন সভা সমিতি ছাড়া। তবে সুপ্রিয়'র উদ্যমে সিলেটে নাটক নিয়ে এসেছে নাগরিক কয়েকবার। তখন আবার আগের হৃদ্যতায় জমে ওঠা। জেনেছি ছোটলু ভাই অসুস্থ ছিলেন। দেখতে যাব যাব করে যাওা হয়ে ওঠেনি। কষ্টটা কাটাতে পারছি না। বিরাট ক্ষতি হল নাটকের, সমাজের আর নিজেরও। টিকসি, চিকসি, শ্রেয়া, ঈরেশ আর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা আর ভালোবাসা। ছোটলু ভাই তুমি ভালো থেকো। শান্তিতে থেকে।

সুলতানা কামাল

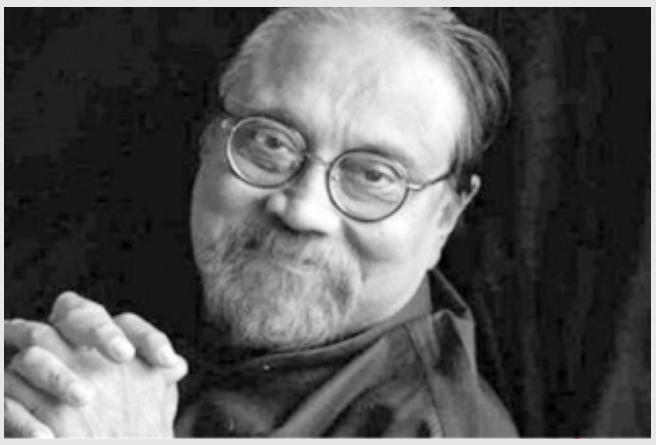

কুনঠি যাও বাহে

কামালউদ্দিন নীলু

পালার আসর ছাড়ি কুনঠি যাও বাহে
খোল করতাল পড়ি রয়,
নট-নটী হগ্গলে তোমার অপেক্ষায়,
গান হুনবার লাগি হগ্গলে খাড়াই আছে
তোমার অপেক্ষায়।

আমাগোরে একেলা ফালাই কুনঠি গেলা বাহে,
কাউরে কিছু না কইয়া উঠি গেলা আসর ছাড়ি।

তোমার যাওনের খবর শুনে গা ছমছম করে
আঁধার রাইতে বাতি নিভ্যা যায়,
রাত হয়ে আসে ঘন,
সগ্গলে আসর ছাড়ি চলি যায়,
একেলা খড়াই আমি তোমার অপেক্ষায়।

যদি দেখা হয় তোমার আমার,
না কউন কথাগুলান সঙ্গে লইয়া
অপেক্ষায় আছি তোমার সঙ্গ পাইবার।

আচানক ঘুইরা দেখি
ঝিকমিক আলোয় খাড়ায় তুমি!
শিশুর লাহান চিৎকার দিয়া কই
বাহে কুনঠি ছিলি তুই,
কুনঠি ছিলি বাহে,
কথা ক কথা ক বাহে।

কেবলি ঝলসানো কালো শশি
চোখে আন্ধার দেখি,
কই তুমি বাহে, তুমি কই!
আচমকা কণ্ঠ একখান ভাসি আসে
চলি যাই বাহে
জীবনের অপূর্ণ বাসনার
ক্ষত চিহ্ন নিয়া।

আমি এক নিভু নিভু দীপ,
আসরে মানায় না আর
ছাড়ি যাই, ছাড়ি যাই, জগৎ সংসার।
শব্দহীন গোরস্তানে
ঘুমায়ে আছি সেঁজুতি সন্ধ্যায়।

বটবৃক্ষের ছায়া ও আশ্রয়

৯-এর পৃষ্ঠার পর

পড়ে তাঁর সাথে লাকসামের নিভৃতচারী একনিষ্ঠ আওয়ামী লীগ কর্মী আবদুল আওয়াল সাহেবের বাসায় উপস্থিতি। তিনি সযত্নে সংরক্ষণ করেছেন অনেক পুরনো কাগজপত্র, সেসব জাদুঘরে দিতে ছিলেন দ্বিধান্বিত, তাঁর আবাসে আলী যাকেরের উপস্থিতি ভাসিয়ে নিয়ে গেল সব দ্বিধা, তিনি সানন্দে আমাদের হাতে তুলে দিলেন এমন সব স্মারক যা' জাদুঘরকে দান করলো অনন্য সমৃদ্ধি, যার মধ্যে রয়েছে সাপ্তাহিক ইত্তেফাক-এর হলদেটে হয়ে যাওয়া বিভিন্ন সংখ্যা, যা দেশের আর কোনো লাইব্রেরি বা আর্কাইভে ছিল না।

বিগত বছরগুলোতে যখন তিনি লড়েছেন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে তখন ক্রমে হয়ে পড়ছিলেন অশক্ত, চলাচল হয়েছিল সীমিত, সেই সময়ও মনে পড়ে, তিনি এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন একক আলোচক হিসেবে। অনেক কর্মসূচির মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আসে ফরেন সার্ভিস একাডেমির শিক্ষার্থীরা, যাঁরা কূটনীতিক কাজে সবে যোগ দিয়েছেন। বিগত বছর সেই দলের সদস্যদের জাদুঘর পরিদর্শনের পর তাঁদের উদ্দেশে অসাধারণ ভাষণ দিয়েছিলেন আলী যাকের। ফরেন সার্ভিসের নবীন-নবীনাদের উদ্দেশ্যে বলবার জন্য তিনি এসেছিলেন আনুষ্ঠানিক পোশাকে, যে কেতাদুরস্তভাব তাঁকেই মানায়। তবে তার চেয়েও বড় কথা তিনি তাঁর সাবলীল ইংরেজিতে তাঁদের উদ্দেশে বললেন বাংলাদেশের কথা, মুক্তিযুদ্ধ এবং বহু মানুষের আত্মদান, সেই আত্মদানের বিনিময়ে পাওয়া স্বদেশ, তার অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ এবং বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের মহিমা তুলে ধরার ক্ষেত্রে নবীন কূটনীতিকের দায়িত্ব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিদেশ মন্ত্রণালয়ের সেই ব্যাচের শিক্ষার্থীরা কখনো ভুলবেন না আলী যাকেরের সেই অভিভাষণ।

তারপর তো রোগ ক্রমে তাঁকে আরো কাবু করে ফেলে। তিনি দাপ্তরিক কাজও করতে পারেন না, গৃহবন্দি ও অশক্ত, তাঁর যে অমন বাচনভঙ্গি সেটাও হারিয়ে ফেলেছেন, এমন অবস্থায়ও আগস্টের ১২ তারিখ বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতা দানের জন্য অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে পরিচয় করিয়ে অনলাইনে সূচনা বক্তব্য প্রদান করলেন তিনি। জাদুঘরের অফিসিয়াল ফেসবুকে রয়ে গেছে তাঁর সেই অংশীদারিত্ব, তিনি নেই তবে তাঁর কাজের রেশ ছড়িয়ে আছে নানাভাবে, আর মিশে আছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরতে পরতে।

থিয়েটারের ক্যাপ্টেন আলী যাকের

অপূর্ব কুমার কুণ্ডু

এটা প্রমাণিত, যার অজ্ঞতা যত বেশি তার অহঙ্কার তত প্রকট। প্রকট অহমিকার এই প্রলয়কালে অপরের পরিশ্রমের ফসল যখন নিজের নামে কেড়ে নেয়া এক নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা তখন পরিশ্রমী মানুষটির মানসিক সান্ত্বনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যের পঙ্‌ক্তিমালা, রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি,/ মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী, সফল নাটক মঞ্চায়নের কৃতিত্বের অধিকারী নাট্যকার-নাট্যকুশলী-নাট্যাভিনেতা নাকি নাট্যনির্দেশক-এই সংশয়ের সমাধান যখন অমীমাংসিত এবং সুনাম কাড়াকাড়ির কুপ্রতিযোগিতা যখন অব্যাহত তখন উপমহাদেশের দুই মাধ্যমের দুই অভিনেতার ঢাকায় বসে উচ্চারিত সংলাপ চিরন্ততে প্রস্ফুটিত। '৯০-এর দশকে ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনে অভিনেতা দিলীপ কুমার বললেন, 'ভাল কাহিনী না হলে ভাল অভিনয় সম্ভব নয়' আর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সেমিনার হলে বসে অভিনেতা আলী যাকের বললেন, ' যে নাটক পড়তে ভাল সেই নাটক দেখতেও ভাল।' নাট্যকার মাত্রই জেনে গেল কি ভাল তার করণীয়। বেশিরভাগটা ভাল এবং খানিকটা কিভাবে কি হলো বিবেচনায় শ্রদ্ধেয় আলী যাকের রূপান্তরিত-অভিনীত-নির্দেশিত নাটক কাঁঠালবাগানের রিভিউ 'রসালো কাঁঠালবাগান' যখন প্রকাশিত হলো জাতীয় দৈনিকের বিনোদন পাতায় তখন তাঁর মন শান্ত-প্রশান্ত এবং তৃপ্ত অপেক্ষার অবসান হওয়ায়। একদিন 'সুবচন নির্বাসন' নাটক জাতীয় দৈনিকে লিখে সমালোচনা করায় তিনি হয়েছিলেন বিব্রত, সমালোচনা লিখে ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে নেয়ার ব্যাপারে ইতিই টানতে হলো কিন্তু নিরপেক্ষ নাট্য সমালোচকের কাজটা কেউ না কেউ করুক এটাই ছিল তাঁর আদৃত। আদর-আপ্যায়নে আর ৪০ মিনিট সময়ের বিশ্লেষণে তাঁর নির্দেশনা ছিল, 'শিল্প নির্মাণ এবং শিল্প পর্যবেক্ষণে কখনই উদ্দেশকে প্রাধান্য দেবে না এবং জানবে, নাট্য সমালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নাটককে পথভ্রষ্ট হতে না দেয়া।' দেনা-পাওনার প্রশ্নে ইউরোপের চলচিত্র বইটি রচনাকালে যখন গবেষণার জন্য বাড়তি অর্থের প্রয়োজন অনিবার্য তখন তার যে ভূমিকা সে কথা বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সাক্ষাতকারে বলতে পারা যাবে কিনা প্রশ্নে তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত, 'আমার যদি কোন ভূমিকা থেকে থাকে তবে সেটা একজন লেখকের লেখা সম্পন্নের জন্য, আমার মহিমা শোনার জন্য নয়।' ফলে কথা বলা হলো না কিন্তু প্রকাশক নিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল এবং আবেদন-নিবেদনে তিনি আমাদের তার আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ দিলেন। বই প্রকাশ পেল। প্রকাশিত বইয়ের নাম 'সেই

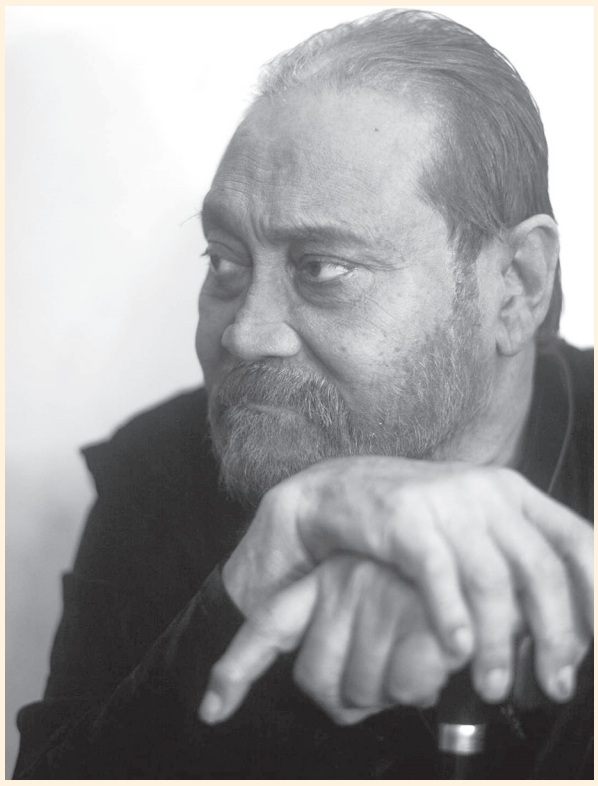

অরুণোদয় থেকে।' অরুণাবেলায় না বরং গোধূলি বেলায় খানিকটা অন্য মনস্ক হয়েই তিনি একাডেমির সেমিনার হলে বলেছিলেন, 'আমি কোন দিন অভিনয়ে ফাঁকি দিইনি। ১০০তম শো শেষ করে যেদিন ১০১তম শো করতে যাচ্ছি সেদিনও যেন মনে হচ্ছে এ আমার প্রথম দিনের প্রথম অভিনয়। একটুও ভুল করা, একটুও অন্য মনস্ক হওয়া চলবে না। অভিনয়ে কোন সংলাপ যদি ভুলেছি তবে সে রাতে চোখে ঘুম আসেনি। অভিনয়ই আমার জীবনের সব। পাশাপাশি এই পরিণত বয়সে এসে মনে হয়, অভিনয় তো তাৎক্ষণিক। এই আছে এই নেই। সৈয়দ শামসুল হক অনূদিত ম্যাকবেথ নাটকের ম্যাকবেথ হয়ে বলা সংলাপ বার বার মনে ভাসে, 'যাও, নিভে যাও, নিভু নিভু দীপ, জীবন নিতান্ত এক চলমান ছায়া, হতভাগ্য এক অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে কিছুকাল লাফায় ঝাপায়, তারপর আর শোনা যায় না সংবাদ।' এই যে অভিনেতার নিরবতার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুর গভীর নীরবতা সেখানে যদি অভিনয় জীবনের সব কথা লিখে যেতে পারতাম, নাট্যজীবনকে এঁকে যেতে পারতাম, নাট্যসঙ্গীদের তুলে ধরতে পারতাম তাহলে হয়ত ভিন্নভাবে থাকা হতো, বাঁচা হতো।' কি হলে কি হতে পারত যদিও ভাবা চলে কিন্তু যেটা বাস্তব হলো সেটা নান্দনিক। দেশের প্রভাবশালী মাসিক ম্যাগাজিন পত্রিকা থেকে সম্মান এবং সম্মানী প্রদানের মধ্য দিয়ে বলা হলো, 'গবেষণার মধ্য দিয়ে আলী যাকেরের সামগ্রিকতা নিয়ে লিখুন।' প্রস্তাবনা পেয়ে আনন্দ আর ধরে না। নাট্যাঙ্গনের নাট্যব্যক্তিত্বদের মতামত নিয়ে, শ্রদ্ধেয় আলী যাকেরকে নিয়ে প্রকাশিত লেখা পড়ে, তাঁর কাছ থেকে তাঁর রচিত বই এবং প্রকাশিতব্য পাণ্ডুলিপি পেয়ে এবং তা অনুধাবন করে নিমগ্নচিত্তে সম্পন্ন করা লেখা প্রকাশিত হতে চলেছে ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয় নিয়ম-নীতি মেনে। নিয়মের মধ্য থেকেই তিনি চিকিৎসা নিচ্ছেন আর মাননীয় স্পিকার শ্রদ্ধেয় ড. শিরীন শারমিনের শ্বশুর শিক্ষাবিদ সৈয়দ বদরুদ্দীন হুসাইনকে নিয়ে 'পদকপ্রাপ্তদের দৃষ্টিতে সৈয়দ বদরুদ্দীন হুসাইন' সেমিনার পেপারের শ্রদ্ধেয় আলী যাকেরের অংশটুকু ওভার ফোনে তিনি শুনছেন সংশোধন-সংযোজন এবং সম্মতি প্রদানের জন্য। তিনি শুনছেন, 'গর্ব করতে চাইলে করাই যায় যে, শম্ভুমিত্র অভিনীত গ্যালিলিও যেখানে দেবতা তুল্য সেখানে তাঁর অভিনীত গ্যালিলিও মর্ত ভূমি থেকে রক্ত মাংসে গড়া মানুষেরই প্রতিনিধিত্ব। গর্ব করে বলাই যায়, ভাষাসৈনিক হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতারে শব্দ সৈনিক হয়ে লড়েছেন, স্টপ জেনোসাইডে কণ্ঠ দিয়েছেন, মামুনুর রশীদের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছেন দেশ স্বাধীন হলে নাটক করব, স্বাধীন দেশে মুনীর চৌধুরীর কবর নাটকে নেতা হয়ে মঞ্চে দাপিয়েছেন, নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের মতো প্রেস্টিজিয়াস নাট্যদলকে সারাটা জীবন ধরে আগলেছেন, আজও দৈহিক ক্লেশকে মেনে নিয়েই মঞ্চ পাদপ্রদীপে গ্যালিলিও হয়ে নক্ষত্রের গতি বিধি পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে মিথ্যার মেঘে ঢাকা সত্যের সূর্যকে খুঁজে চলেছেন। তথাপি তিনি কেন দিন অহমিকাকে প্রশ্রয় দেননি, স্বভাবে জুড়ে নিয়েছেন শিশুর সারল্য, পথ মাপায় দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং নাট্যযজ্ঞে নিবেদিত, তিনি তিনিই, তিনি সৈয়দ শামসুল হকের নূরলদীন, সকলের প্রিয় অভিনেতা আলী যাকের। তার অভিমত'। ওভার ফোনে শুনতে শুনতে তিনি অসুস্থতাকে ভুলে শিশুর সারল্যে অট্টহাসিতে উছলে উঠলেন। হাসিতে আব্দুস সেলিমের গ্যালিলিও যেন বেঁচে থাকা আর মৃত্যুর মধ্যবর্তী পথে দাঁড়িয়ে জীবনের হিসাব-নিকাশ মেলালেন। সৈয়দ শামসুল হকের নূরলদীনের আত্মত্যাগের সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন, আসাদুজ্জামান নূরের দেওয়ান গাজী হয়ে স্বরূপে ফিরলেন, হুমায়ূন আহমেদের মামাকে ইমেজ থেকে লাইভে আনলেন আর কার্ল স্যুখমায়ারের কোপেনিকের ক্যাপ্টেন হয়ে নিরুদ্দেশে চোখ ভাসিয়ে মোবাইল রূপ স্টিয়ারিং ফেলে, 'মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, 'স্বামী,/আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি' রূপ আজীবনের পছন্দ রবীন্দ্র দর্শন উচ্চারণের মধ্য দিয়ে মননের ডানায় ভর করে থিয়েটারের ক্যাপ্টেন আলী যাকের যেন স্বপ্নের দিগন্তে উড়াল দিলেন।

জনকণ্ঠ : প্রকাশিত ডিসেম্বর ০৩, ২০২০

কোন কালে, কত না অতীত কালে

রেজিনা বেগম

আলী যাকের। নামটা আমার শোনা সেই কোন অতীতকালে, ছোটবেলায়। নামটার গুরুত্ব বা মাহাত্ম্য বুঝে ওঠা তখন সাধ্যের বাইরে। বড়ো ভাই অনেকটাই বড়ো, আমি যখন স্কুলের চেহারা দেখিনি, ভাই তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। আবছা মনে পড়ে আমার বিশাল বড়ো ভাই তার চাইতেও বিশাল কোন এক মানুষের নাম সমীহের সাথে বলতো বাসার অন্যদের কাছে । আমি হাতে ছোট্ট কাগজের পুতুল নিয়ে যেই বিশাল মানুষের নাম শুনেছি, তাকে প্রত্যক্ষ করলাম অনেক পরে টেলিভিশনের নাটকের মধ্যে। টেলিভিশনের মানুষটিকে খুব আপন মনে হতে লাগলো। এর একটা ব্যাখ্যা আছে, টিভি নাটকের যে চরিত্রগুলো করে মনে চিরস্থায়ী দখলসত্ত্ব তিনি নিয়েছিলেন, সেই চরিত্রগুলো ছিল পরিবারের প্রিয় মামা বা চাচার, আর সব পরিবারেরই সন্তানদের কাছে মামা-চাচারা প্রিয় মানুষ হন। আমিও ভাবতে লাগলাম তিনি আমার সেঝ মামা কিংবা ছোট চাচা, আর এভাবে চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি আমার একান্ত কাছের পরিচিতজন হয়ে ওঠেন। আরও পরে যখন শিক্ষার্থীর জীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করি, সুযোগ পাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে কাজ করবার, তখন দুটি কারণে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়েছিল, প্রথমত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, আর দ্বিতীয়টি ছিল কিছুটা ছেলেমানুষির, এই প্রতিষ্ঠানটির যারা কর্ণধার তাদের মধ্যে আছেন আলী যাকের, আসাদুজ্জামান নূর ও সারা যাকেরের মতো সেলিব্রিটি, বিশেষ করে যাকের ভাই আর নূর ভাই তখন তুমুল জনপ্রিয়, তাদের দেখবো, তাদের সাথে কাজ করবো, রাতারাতি নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ একজন মনে হতে লাগলো। জাদুঘরের কোন এক অনুষ্ঠানে ক্যামেরা হাতে যাকের ভাইকে প্রথম দেখি, আমাকে বলা প্রথম কথাটি ছিল, তুমিই বুঝি মামুনের ছাত্রী, এখানে জয়েন করেছো ? আমার ইতিবাচক উত্তর শুনে বলেছিলেন, তুমি তো এম ফিল করেছো, তা পিএইচডি করবে না? পিএইচডি টা করো কিন্তু, এমফিল করে থেমে গেলে তো হবে না। দূর থেকে যে মানুষটাকে আপনজন মনে হতো তাঁর এই স্নেহের উচ্চারণের জবাব সেদিন দিতে পারিনি এতটাই আপ্লুত হয়েছিলাম আবেগে, তিনি যে আমার সম্পর্কে এতটুকু জানেন এটাই তো বিশ্বাস হচ্ছিল না। গত কয়েকদিনে যারা গণমাধ্যমকে অনুসরণ করেছেন, তারা তার জীবনকর্মের পরিধি জানেন। সে প্রসঙ্গে বলবার যোগ্যতা আমার নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি বাইরের বিশাল অবয়বের মতোনই বিশাল হৃদয় ছিল তাঁর। কর্মক্ষেত্রের অধিকর্তা হিসেবে যখনই দেখা হয়েছে, একান্ত আপনজনের আন্তরিকতার ছোঁয়া থাকত কণ্ঠে। যাকের ভাই পেশাগতভাবে যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন, সেখানে একবার গিয়েছিলাম কোন এক দাপ্তরিক কাজে। তাঁর অফিসের বাইরে খোলা ছাদে গাছের সমারোহের দিকে তাকিয়েছিলাম, বিষয়টি তিনি ঠিকই লক্ষ্য করলেন, হেসে আমাকে বললেন, বুঝলে গাছপালা ছাড়া আমি থাকতে পারি না। আপাতদৃষ্টিতে এই পূর্ণনগরকেন্দ্রিক মানুষটির মধ্যে যে মাটির টান লুকিয়ে আছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি এই একটি কথায়। তিনি অন্তরে লালন করতেন ঐ মামা কিংবা চাচা চরিত্রের মতোন নির্মল আনন্দ আর মজার এক সত্ত্বাকে। জাদুঘরের কোন এক অনুষ্ঠানে দুপুরের খাবারের আয়োজন চলছিল, অনেকেই জানেন যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সদস্যরা অনেকটা পরিবারের মতো, হাসি আনন্দের অভাব হয়না, তো সেদিন দুপুরে খাবারের সময় আমি রান্নার খালাকে বলছিলাম, খালা আমি কিন্তু মাথা খাব, আমার জন্য একটা মাথা রাখবে (অবশ্যই মাছের মাথা), খেয়াল করিনি পেছনে যাকের ভাই, হঠাৎ শুনলাম বলে উঠলেন, 'হায় হায়, রেজিনা তুমিও মাথা খাও?' একটা ছোট্ট কথা মানুষকে যে কতো আনন্দ দিতে পারে, যাকের ভাই খুব ভালো জানতেন। তাঁর সঙ্গে খুব বেশি কাজ করবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। যতটুকু দেখেছি তাকে, সেই স্মৃতি আমার কাছে অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে।

যাকের ভাই, আমার আজীবন দুঃখ থেকে যাবে আপনাকে নিজ মুখে বলা হয়নি আপনার প্রথম দিনের সেই কথা আমি রেখেছি। তখন আপনি অসুস্থ, জটিল চিকিৎসা পদ্ধতিতে অনেকটাই ক্লান্ত। আপনার সঙ্গে দেখাও হলো না, বলাও হলো না। আর এক মহামারী আপনাকে শেষ শ্রদ্ধাটুকু জানাতে দিল না, আমি তখন ঘরবন্দী। আপনি তো নূরলদীনের মতোই বিশ্বাস করতেন জীবনের মরণ হয়না। আমি সবসময়ে বলি, মানুষ ততদিন বাঁচে যতদিন সে কারো স্মৃতিতে থাকে। আপনি তো অসংখ্য মানুষের স্মৃতিতে, মনে বেঁচে থাকবেন আজীবন। অগ্রজের স্মৃতি বহন করে চলে অনুজেরা, পরবর্তী প্রজন্মকে শোনায়, কোন কালে, কতনা অতীত কালে...।

আলোর পথযাত্রী...

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি

আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্বপ্ন-যাত্রায়

মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক ষষ্ঠ প্রামাণ্যচিত্র উৎসবে

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলির সাথে

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ সম্মাননা অনুষ্ঠানে

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য অনুদান গ্রহণ অনুষ্ঠানে

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গণহত্যা ও ন্যায়বিচার সম্মিলনে

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে জাপানি সহযোগিতা

মুক্তির উৎসবে

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official